4- 202

Datta's Educational Series.

THE

PROSE AND POETICAL READER.

BY

NABINA CHANDRA DATTA,

Compiler of "Khagola Bibaran," "Kshetra Byabahar," &c.

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY ESTD. 1883

সাহিত্যমঞ্জরী।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যাতত্র সুদুর্লভা"।

Calcutta:

PRINTED AT THE SUCHARU PRESS, BY LALLCHAND BISWAS,
NO. 336, CHITPUR ROAD.

1873.

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা 2৬৯.২
পরিগ্রহণ সংখ্যা .... AC
পরিগ্রহণের তারিখ ৩/০৮

গ্রন্থার্পণ।

প্রীতিভাজন শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রিয়সুহৃদ্বরেষু।

আর্য্য!

আপনার সাহিত্যে বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া এই অভিনব "সাহিত্যমঞ্জরী" নামক গ্রন্থখানি আমি আপনাকেই অর্পণ করিলাম। বিশেষতঃ, এই গ্রন্থ কতদূর আদরের সামগ্রী হইয়াছে তাহা জানিনা, সেই জন্য ইহাকে এককালে সাধারণের হস্তে দিতে আমার সাহস হয় না, আপনার হস্তে দিলাম, আপনার সংশ্রবে ইহা যে খানে যাইবে আদরে পরিগৃহীত হইবে। ফলতঃ, ইহা আপনাকেই দিবার যোগ্য, মঞ্জরী অতি কোমল; আপনার ন্যায় কোমল ও মধুর প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের নিকটে ইহার রক্ষা হওয়া সম্ভব।

ইতি শ্রীনবীনচন্দ্র দত্তস্য

সহৃদয় নিবেদনং।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ বালকগণের সাহিত্যপাঠোপযোগী গ্রন্থ অতি বিরল। এই দেখিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হই। সময়ে সময়ে আমার যে সকল গদ্য-প্রবন্ধ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়েকটী নির্ব্বাচন করিয়া ও দুই একটী বিষয় শুভকরী পত্রিকা, রহস্য-সন্দর্ভ প্রভৃতি হইতে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্যপ্রবন্ধ গুলি প্রায় সমুদায়ই সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে বিশ্বান্তর্গত নানা প্রকার প্রাকৃত বিষয়ের বৃত্তান্ত, জনসমাজ সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব ইত্যাদি নানা হিতকর বিষয় সকল নিবেশিত হইয়াছে। ভাষা শিক্ষাসহকারে প্রাকৃত পদার্থ ও প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করা যে বালকগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য। এই গ্রন্থে যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে, বোধকরি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত উপাখ্যান পাঠ অপেক্ষা অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক।

পরিশেষে, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা, যোড়াবাগান, নং ৯
৬ই অগ্রহায়ণ। ১২৮০ সাল।

শ্রীনবীন চন্দ্র দত্ত।

সূচী পত্র।

গদ্য।

পদ্য।

প্র
১১১

শুদ্ধিপত্র।

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	শয়নমন্দির	শয়নমন্দির,
৫	৪	ইতস্ততঃ	লুণ্ঠন
৮	১৯	মরুজ্জ	মুরজ
৮	২২	ডালে	শাখায়
৯	১১	হর্ম্মের চূর্ণোপরি	হর্ম্মোপরি
৯	১৮	ছিন্নিকৃত	ছিন্নীকৃত
১৩	১০	ভ্রমিতি	ভ্রমিতে
৬০	২৩	শাস্ত্রশিক্ষায়	শাস্ত্র শিক্ষায়
১১৩	৫	অবিশ্রয়	অধিশ্রয়
১৫৪	২১	বিন্দু	রত্ন
১৫৫	২	সিক্তধরাপরি	অতিত্বরা গড়ি
১৫৫	৭	কুলে	স্রোতঃ
১৫৫	৮	খোবেলো	শাখায়
১৫৫	৯	স্বর্ণ অঙ্গ বিহঙ্গম	হেমাঙ্গ বিহঙ্গ খোবে
১৯২	৭	থাকে	থাকেন

সাহিত্যমঞ্জরী।

পশ্চিমযামে প্রকৃতি সন্দর্শন।

গত রজনী আমি দশ ঘটিকার সময় শয়ন করিয়াছিলাম। আমার পরম রমণীয় শয়ন-মন্দির এবং সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যা সংস্থাপিত ছিল না বটে—এক সামান্য গৃহ ও তদুপযুক্ত শয্যাই আমার ঐহিক সম্পত্তি, তথাপি দিবাভাগের পরিশ্রমের পর তথায় শরীর সংস্থাপন করিয়া আমি অনির্ব্বচনীয় সচ্ছন্দ লাভ করিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, আমরা যতই হীনাবস্থায় পতিত হই না কেন, সকল অবস্থাতেই কিছু কিছু সুখ-ভোগ করিতে পারা যায়, এই রূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমত সময়ে নিদ্রা আসিয়া সহসা আমার নয়ন-যুগল অধিকার ও চৈতন্য হরণ করিল। গুরুতর পরিশ্রমের পর প্রায়ই প্রগাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে, সুতরাং আমি ক্লান্তি-হারিণী সুষুপ্তির মনোরম আবেশে অভিভূত হইয়া যামিনী-যাপন করিলাম। ছয় হোরা নিদ্রা হইলেই আমার যথেষ্ট হয়, সুতরাং চারিটার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অতি সুনিদ্রা হইয়াছিল বলিয়া তৎকালে আমার আর কিছুমাত্র জড়তা বা আলস্য ছিল না। দেখি-

লাম, সমুদায় ক্লান্তি দূরীভূত হইয়াছে এবং মন প্রসন্ন ও আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া [redacted] প্রফুল্ল করিতেছে। আর শয্যায় পতিত থা[redacted] নিতান্ত বিতৃষ্ণা জন্মিল, আমি তৎক্ষণাৎ গৃহে[redacted]হিরে গিয়া দণ্ডায়-মান হইলাম। দেখিলাম, তখন প্রকৃতি এ[redacted]আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে। পৃথিবী শীতল [redacted] নির্ম্মল জ্যোৎস্নাজালে দিগন্ত উদ্ভাসিত [redacted] সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে পাদ[redacted] সঞ্চারিত ও তদ্দ্বারা দিক্ সকল এক অ[redacted] শব্দায়মান হইতেছে। চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত [redacted] নব আনন্দ অনুভব করিলাম। বোধ হইল [redacted] আমি দিগ্বলয়ের কেন্দ্র স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছি; কিন্তু দিবা-ভাগে ঐ বলয়াকার দিঙ্মণ্ডল যত বিস্তীর্ণ দেখায়, আলো-কের স্বল্পতা প্রযুক্ত তখন তাহাকে তদপেক্ষা অনেক সঙ্কুচিত বোধ হইল। যাহা হউক, তদ্দ্বারা দৃশ্যের শোভা বর্দ্ধিত বই খর্ব্ব হয় নাই। আবার যখন আমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তখন আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। দেখিলাম, নভোমণ্ডল ক্রমশঃ অবনত হইয়া দিগ্বলয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তথায় ভূলোক ও দ্যুলোক যেন একত্র সংযুক্ত বোধ হই-তেছে। অচিরাতিক্রান্ত বর্ষাকালীন নীল নীরদচয়ের আব-রণ হইতে মুক্ত হওয়াতে, আকাশ মনোহারিণী অসিশ্যাম-শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিও প্রাবৃটকালীন জলদা-বলীর অপূর্ব্ব নীলিমা ও আড়ম্বরে আমি প্রীতি লাভই

করিয়া থাকি, তথাপি একাদিক্রমে অনেক দিন সেই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া, এখন শরতের মেঘমুক্ত অম্বরের সহজ আনীল আভার শোভায় অধিকতর আনন্দ হইতে লাগিল। তাদৃশ স্বচ্ছ নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে, ঠিক আমার মস্তকোপরি সমুজ্জল সুধাংশুমণ্ডল, তথা হইতে সিত রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া ভুবন আলোকময় করিতেছিল ও তাহার চতুঃপার্শ্বে দুই চারিটী মাত্র অতি উজ্জল নক্ষত্র শোভা পাইতেছিল; অপরাপর সমুদায় গ্রহনক্ষত্র নিশাকরের সর্ব্বাতিশায়ী জ্যোতিঃ প্রভাবে ম্লান হইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। ফলতঃ, অন্তরীক্ষকে বোধ হইতে লাগিল, যেন একখানি আনীল চন্দ্রাতপ ও তাহার মধ্যস্থল হীরক মণিতে গুম্ফিত হইয়াছে।

কল্পনাশক্তি মধ্যে মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকে, সেই আনন্দ বস্তুতঃ অমূলক হইলেও ইন্দ্রিয়ভোগ অপেক্ষা তাহা দোষস্পর্শ শূন্য ও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। আমার মনে হইল, যেন আমি এক অর্দ্ধ গোলাকৃতি বিস্তীর্ণ বিনোদ গৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছি—দিগ্বলয় যেন প্রাসাদকুট্টিমের পরিধি এবং নভোমণ্ডল তাহার ছাদ, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ তথায় দীপমালার কার্য্য করিতেছে, এবং গন্ধবহ মন্দমন্দ বীজন করিয়া আমার সেবা করিতেছে। আবার, নিশাতুষার বিটপিগণের উন্নত পল্লব হইতে নিম্নস্থিত পল্লবের উপর বিন্দু বিন্দু পতিত হইয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া আমার কর্ণসুখ জন্মাইতেছে। বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ডের ধ্বনির

ন্যায় উক্ত নৈসর্গিক শব্দের মূর্চ্ছনা বা লয়বিশেষ ছিল না বটে, তথাপি তাহার মাধুর্য্যে আমি মোহিত হইলাম। এই নিরুপম প্রাসাদ মধ্যে থাকিয়া আমি আপনাকে রাজাধিরাজ অপেক্ষাও অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী ও সৌভাগ্য-সম্পন্ন মানিলাম, এবং আমার সন্তোষের নিমিত্ত যিনি ঐ সমস্ত সুখসাধন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার শতসহস্র বার ধন্যবাদ করিলাম।

আহা সেই সময়ের ভাব কি চমৎকার! তাহা নিশীথ সময়ের ন্যায় প্রগাঢ় ও ভয়ঙ্করও নহে, এবং প্রাতঃকালের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নই আমোদ-ভূয়িষ্ঠও নহে। ঘোরা তামসী নিশীথিনীর মধ্যভাগে বোধ হয়, কেবল সমস্ত সংসার কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে, আবার রজনী অবসানে, দিবাভাগে বোধ হয় যেন বিষয়-আসবে সংসার উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছে। কিন্তু এখন প্রকৃতিকে দেখিলে বোধ হয়, যেন শান্তিবিধায়িনী বিভাবরী বসুমাতার সন্তানদিগকে শান্তিবিধান ও স্নিগ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পলায়ন করিতেছে। এই শেষ যামিনী কি রমণীয় কাল! এই সময়ে সকলই প্রশান্ত। আমাদের মনে সাংসারিক চিন্তা এখনও স্থান পায় নাই, কর্ণ বধির করে এমন যে বিষয়-কোলাহল, এখনও তাহা আরম্ভ হয় নাই, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দ্বার এখনও মুক্ত হয় নাই। সমস্ত দিবসের মধ্যে প্রকৃতি এক সময়েও এমন মধুর ভাব ধারণ করে না, এই সময়ে সকলই মধুময় পবিত্র ও পরমার্থ রসে পরিপূরিত।

শেষ যামিনীর এই রূপ অপূর্ব্ব শোভায়, যে ব্যক্তি সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ দেখিতে না পায়, তাহার হৃদয় পাষাণ, এবং যাহারা আলস্যের আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া অধিক বেলা পর্য্যন্ত শয্যায় ইতস্ততঃ করে ও ঐ পবিত্র শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়, তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য।

প্রভাত বর্ণন।

গত নিশা হেরি উষা করে আগমন।
পূর্ব্ব ভাগে রক্ত রাগে রাঙ্গিল গগণ॥
দেখি দিন হল ক্ষীণ নিশাকর-কর।
একে একে লুকাইল তারকা-নিকর॥
তমোময় বেণুবনে বসিয়া কুলায়।
হেরি ভোরে সুখ ভরে ফিঙা গান গায়॥
অল্প অল্প অন্ধকারে সমাবৃত প্রায়।
পূর্ব্ব দিকে পাদপের মাথা দেখা যায়॥
মন্দ মন্দ বহে ধীর শীতল সমীর।
সেবনে সে সমীরণ যুড়ায় শরীর॥
পড়িছে শিশির বিন্দু পাতায় পাতায়।
শোভিছে সুন্দর অতি মুক্তাফল প্রায়॥
ললিত পঞ্চম স্বরে ডাকিল কোকিল।
জাগিল জগৎ বাসী পূরিল অখিল॥

তরুশাখে বসি সুখে পাখী করে গান।
শুনি সে সুধার স্বর যুড়াইছে কাণ॥
উদিত অরুণ সহ তরুণ তপন।
উত্তপ্ত কাঞ্চন কান্তি লাঞ্ছিত বরণ॥
দীপ্তিমান্ ভানু ভাতি ভুবন ভরিল।
আলোকে ভূলোকলোকে পুলকে পূরিল॥
ফুটিল কুসুম কলি কাননে উদ্যানে।
ছুটিল সৌরভ অলি ধায় মধুপানে॥
মুদিত কুমুদ-কুল প্রফুল্ল কমল।
তোষামোদী সম ভ্রমে ভ্রমর সকল॥
উদিছে তরঙ্গ রঙ্গ সরসী সলিলে।
হেলিছে দুলিছে পদ্ম মৃদুল অনিলে॥
তটিনীতরঙ্গে রঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া।
ভ্রমিছে মরালদল ডাকিয়া ডাকিয়া॥
ধীরে ধীরে ভ্রমে তীরে বলাকার দল।
ডাকিছে ভাসিছে জলে সারস সকল॥
রাখাল গোপাল লয়ে নাচিতে নাচিতে।
চলিল মাঠেতে সবে প্রফুল্লিত চিতে॥
বৃষভ লাঙ্গল আদি লয়ে অতি সুখে।
চলিছে কৃষকগণ ক্ষেত্র অভিমুখে॥
দেখিয়া প্রভাত শোভা এই মনে হয়।
শিশুকাল সকলেরি অতি সুখময়॥

অযোধ্যার আত্মদুর্দ্দশা বর্ণন।

কুশাবর্ত্তী নগরীর রাজপ্রাসাদের শয্যা-গৃহে একদা রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ শয়ান আছেন; রাত্রি প্রায় দুই প্রহর; দীপশিখা চঞ্চল ভাবে মৃদুমন্দ জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছে; পরিজনেরা সকলেই সুপ্ত, কেবল তিনি মাত্র জাগ্রৎ ছিলেন। এমন সময়ে বিরহিণী-বেশ-ধারিণী একটী রমণী মহারাজের জয় হউক বলিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল, তথাপি তাহার মধ্যে এক জন অপরিচিত রমণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং ঈষৎ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আমার ঘরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি তুমি অনায়াসে প্রবেশ করিয়াছ, অথচ তোমার কোন যোগ প্রভাব দেখিতেছি না; কিন্তু হিমসেকে নলিনী যেমন মলিনা হইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি বিরহিণীর আকার ধারণ করিয়া লাবণ্য হীনা হইয়াছ। অতএব হে শুভে! বল তুমি কে? কাহার বা পরিগ্রহ? কি জন্যই বা আমার নিকটে আসিয়াছ? রঘু-বংশীয়দিগের মনোবৃত্তি পরদারে বিমুখ এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া আনুপূর্ব্বীক আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন কর।" রামাত্মজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অবলা বলিলেন। "মহারাজ! তোমার পিতা বিনা দোষে যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত প্রজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোলকধামে গমন করিয়াছেন; আমি সেই অযোধ্যা পুরীর অধিদেবতা, সম্প্রতি

অনাথা হইয়াছি। পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা আমাকে এরূপ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছিলেন, যে অলকাপুরীও আমার নিকটে দাঁড়াইতে পারিত না; কিন্তু হে প্রবল প্রতাপ সূর্য্যবংশীয় রাজন্! তুমি বিদ্যমান থাকিতেও আমার এরূপ দুর্দ্দশা হইল।"

সূর্য্যাস্তের পর কখন কখন উগ্র বাত্যা দ্বারা মেঘ সকল সঞ্চালিত হইয়া গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে যেমন মধুর প্রদোষ কাল শোভাহীন হয়; আমার প্রভুর অবিদ্যমান-বশতঃ শত শত রাজপ্রাসাদ ও দীর্ঘ দীর্ঘ প্রাচীর পতিত ও পর্য্যস্ত হইবায় অবিকল তদ্রূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। অগ্রে যে রাজপথে অভিসারিকাগণ নূপুরধ্বনি করিতে করিতে রত্না-লোক বিস্তার করিয়া প্রিয়তমের অন্বেষণে গমন করিত, এখন সেই রাজমার্গে শৃগালেরা মুখোত্থিত উল্কালোকে আমিষ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। অগ্রে যে দীর্ঘিকার জলে প্রমদাগণ করাস্ফালন করিলে ধীর ধ্বনি উদ্গাত হইত, সম্প্রতি সেই বাপীনীরে বন্য মহিষেরা শৃঙ্গাঘাৎ করিয়া কর্কশ শব্দ বিস্তার করিতেছে। অগ্রে যে সকল ময়ূর মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি হইলেই অমনি পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিত, এখন সেই কলাপীসমূহ মরুজশব্দাভাবে নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের আবাস-যষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দাবানলে কলাপচক্র পুড়িয়া গিয়াছে, এখন বনবহ্নির্ক্ষের ডালে বসিয়া রহিয়াছে। অগ্রে যে সোপান-পথে রমণীগণ আর্দ্র অলক্তাক্ত পদক্ষেপণ করিয়া দ্বিতল গেহে গমন করিত, ইদানী সেই সিঁড়িতে শার্দ্দূলেরা

হরিণ দেহ সদ্য বিদীর্ণ করিয়া রুধিরলিপ্ত পদ বিক্ষেপ করিতেছে। করী পদ্মবনে অবতীর্ণ হইয়াছে ও করেণু আসিয়া তাহার মুখে মৃণাল-ভঙ্গ তুলিয়া দিতেছে, এই ভাবের চিত্র অগ্রে গৃহের শোভা সম্পাদন করিত, অধুনা সেই চিত্র-দ্বিপকে সিংহেরা প্রকৃত হস্তীজ্ঞানে রাগোজ্জ্বলিত হইয়া নখাঙ্কুশাঘাতে তাহাদের কুম্ভ বিদীর্ণ করিতেছে। অগ্রে স্তম্ভোপরি যোষিৎজাতির যে সকল দারুময়ী প্রতি-যাতনা নানা বর্ণে সুশোভিত ছিল, এক্ষণে তাহাদিগের বর্ণ-বিন্যাস উঠিয়া গিয়া ধূসর বর্ণ হইয়াছে, এবং সর্পকঞ্চুক স্তনোপরি পতিত হইয়া স্তনাবরণ হইয়াছে। অগ্রে যে হর্ম্মের চূর্ণোপরি চন্দ্রালোক পতিত হইলে অতিশয় দর্শ-নীয় হইত, কালক্রমে সেই সকল গৃহে ইতস্ততঃ তৃণাঙ্কুর উদ্গাত হইয়াছে ও শৈবাল ধরিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, অংশুমালীর কিরণমালা মুক্তামালার ন্যায় বিশুদ্ধ হইলেও তাহাতে আর প্রতিফলিত হইতেছে না। অগ্রে যে সকল উদ্যান-লতার শাখাগুলি সদয় ভাবে নম্র করিয়া বিলাসীগণ পুষ্পাচয়ন করিত, এখন সেই সকল উপবন-লতিকা বানরতুল্য বন্য পুলিন্দকর্ত্তৃক ছিন্নিকৃত হইতেছে। অগ্রে যে সকল গবাক্ষ নিশাকালে দীপালোকে আলো-কিত ও দিবসে কামিনীকুলের মুখশোভায় সুশোভিত হইত, এবং রন্ধন-শালার প্রভূত ধুমোদ্গমে পরিপূর্ণ থাকিত, ইদানী সেই সকল জালক ঊর্ণনাভির ঊর্ণাজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অগ্রে যে সরযূ নদীর নির্ম্মল জলে তাদৃশ পৌরবর্গ অঙ্গে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া অবগাহন করিত;

এবং বিবিধ প্রকার পুজোপহারে শৈবলিনী তটের উদার শোভা বিস্তার করিত, হা! এখন সেই স্রোতস্বতী কেবল বেনাবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

হে রাঘব শ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এ অশরণা এখন এই প্রার্থনা করে, যে যেমন তোমার পিতা মানুষীতনু পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্ম মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ তুমি এই কুশাবর্ত্তী পরিত্যাগ করিয়া আপনার কুল-রাজধানী উত্তর কোশলায় গমন কর। অযোধ্যা পুরীর এই করুণজনক বাক্যের অবসান হইলে, কুশাবর্ত্তীশ্বর কুশ তথাস্তু বলিয়া আপনার পিতৃভূমিতে গমন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং অযোধ্যা পুরীর অধিদেবতাও প্রফুল্ল বদনে আন্তরিক প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া তিরোহিত হইলেন।

মন্দোদরীর প্রতি দশানন।

কি কথা কহিলা অয়ি রক্ষকুলেশ্বরী ?
বীরাঙ্গজা, বীরপত্নী, বীর-প্রসবিনী,
বীর্য্যবতী-বামা যেই, তার কি বক্তব্য এই,
—হা কি লজ্জা! হলাহল উগারে ফণিনী,
সুধাস্রাবে বিধু-প্রিয়া চন্দ্রিকা সুন্দরী। ১

দুরদৃষ্ট মম!—তাই ও বিধুবদনে,
বিষময় সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত!

কোথা রক্ষকুলেশ্বর, কোথা [illegible]
কোথা সন্ধি! মৃগপতি শিবার [illegible]
সন্ধিবারে সম্মত কি হয় বরাননে? ২

প্রাণপ্রিয় যেই জন কীর্ত্তিপ্রিয় [illegible]
[illegible] নিস্তেজ যেই, করে সেই [illegible]
সন্ধি প্রবলের সহ, কিন্তু প্রা[illegible]
কিসে সেইরূপ হীন [illegible]
এখন ত সেই ভুজ[illegible]। ৩

সত্য রাঘবের রণে [illegible]জীবন,
হইল অসংখ্য পুত্র, বহুসংখ্য যোধ,
অসংখ্য শোকের বাণ, জর্জ্জরিল মম প্রাণ,
তবু আমি সে সকল করি তুচ্ছ বোধ,
শোকে অধীরিতে নারে সুরেন্দ্রের [illegible]

পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, বান্ধব, স্বজন,
শোকে সমাচ্ছন্ন হয়ে, হীন বলগণ,
বর্ষে মাত্র অশ্রুনীর, কিন্তু যে যথার্থ বীর,
সে স্বজন-হন্তা শির না করি ছেদন,
কখন শোকের অশ্রু করে না ক্ষেপণ। ৫

বধিয়াছে তাপস রাঘব দৈব বলে,
মম বংশধরগণে,—এক এক জন,

[illegible]—শূরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিত,
অন্যায় সমরে তারে ধ্বংসিল লক্ষ্মণ !
[illegible]ণে হৃদয়ে কোপ-হুতাশন জ্বলে। ৬

হেন দুরাচার পাপি শ্রেষ্ঠ নরাধম
সনে আমি সন্ধি করি রাখিব জীবন ?
[illegible]বনে, কোন্ সুখ আস্বাদনে,
রক্ষিব হায়রে, ইথে কিবা প্রয়োজন ?
আত্মহত্যা করা [illegible] উত্তম। ৭

নাই ভাই কুম্ভকর্ণ!—নরামর ত্রাস,
অজেয় সমরে—নাই, বীরবাহু বীর,
বীরকুলচূড়া যেই, সেই মেঘনাদ নেই,
[illegible] জীবনে, যারা গর্ব্ব এ পুরীর
[illegible]বে নাশিল রাঘব চীর-বাস। ৮

এমন অমূল্য বীররত্ন-অগণন,
হারাইয়া আপনার এছার জীবন,—
এ ঘৃণ্যজীবন হায় ! কোন্ সুখ প্রত্যাশয়,
রক্ষি ? হয়েছি আমি নিস্তেজ এমন !
স্বপ্নেও এরূপ প্রিয়ে, ভেবো না কখন। ৯

স্ত্রীবুদ্ধি তোমার !—তুমি যদিও ধীমতী,
হও স্থলোচনে,—তাই করহ বিশ্বাস,

রাঘব অখিল স্বামী, কি আর কহিব আমি,
রাম যদি ঈশ্বর, তা হলে বনে বাস,
করিবে কি দুঃখে, ভাল কহ দেখি সতি ? ১০

চিদানন্দ চিন্ময় বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর,
কমলা-বল্লভ, যাঁর—চরণ কমল,
কমলা কমল করে, যতনে সেবন করে,
যে পদ ধ্যায়েন ধ্যানে, যোগী ঋষিদল,
যে পদ সমাধি করি চিন্তেন শঙ্কর। ১১

হায়রে সে শ্রীপদের এই পরিণাম !
ভ্রমিতি প্রান্তরে কুশাঙ্কুরে হয় ক্ষত,
কত রক্ত ধারা বহে তবু অবোধের ন্যায় কহে,
নিতান্তই মায়ামুগ্ধ অজ্ঞ জন মত,
গোলকের পতি, এই দাশরথী রাম। ১২

ভাসায়েছে সে কুহকী সিন্ধুজলে শিলা,
আশ্চর্য্য কি, নল-করস্পর্শে শিলা ভাসে,
শুদ্ধ গৌতমের বরে, পদরজ দানে করে,
শিলাময়ী অহল্যারে মানবী, প্রকাশে,
রামের এমন তাতে কিবা দৈবলীলা !

ঐন্দ্রজালে মুগ্ধ হয় রমণীর মন,
চতুর সুবিজ্ঞ তাতে উদ্‌ভ্রান্ত না হয় !

রাম যদি বিভু হবে, ভরত কি জন্যে তবে,
দিবে তারে জনশূন্য অরণ্যে আশ্রয়।
কেন ব্যাধ বেশে বনে করিবে ভ্রমণ। ১৪

থাক্ এসকল কথা—সীতা যদি হয়
মূর্ত্তিমতী কমলা, বল না বল তবে
অশোক কানন মাঝে, দীনা কাঙ্গালিনী সাজে,
কাঁদে কেন অনুক্ষণ রাম রাম রবে ?
কমলার প্রাণে এত যাতনা কি সয় ? ১৫

যে জানকী লাগি মম প্রিয় সহোদর,
প্রাণাধিক পুত্র সব বান্ধব স্বজন,
ব্যয়িল জীবন ধন, সে জানকী সমর্পণ,
জীবিয়া কি করিবারে পারে দশানন !
সে কি এত কাপুরুষ নিস্তেজ পামর ? ১৬

হয় হোক্ রামচন্দ্র অখিলের স্বামী,
হয় হোক্ সীতা মূর্ত্তিমতী পদ্মালয়া,
স্ববংশে বিধ্বংস হই, তথাপি সম্মত নই,
প্রার্থনা করিতে রাম—ভিক্ষুকের দয়া !
বরং মরণ রণে শ্লাঘ্য মানি আমি। ১৭

বীর বাক্যাবলী।

প্রাকৃতিক আলোচনা কি মনোহর !

যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এই তত্ত্বানুসন্ধানে অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হয় এবং মনুষ্য মাত্রেই এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন। প্রাকৃতিক আলোচনাতে বাল্যারোপিত ও অজ্ঞানসম্ভূত কুসংস্কার সকল সমূলে উন্মূলন হইয়া যায়, ইহার দ্বারা নির্ম্মল জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া তমসাচ্ছন্ন মনকে আলোকময় করে; যে দেশে যে পরিমাণে প্রাকৃতিক বিদ্যার আলোচনা হইয়া থাকে, তত্রত্য লোকেরা সেই পরিমাণে সভ্যতা-পদবীতে অধিরূঢ় হয়, অর্থাৎ সেই পরিমাণে তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রাকৃতিক জ্ঞান দ্বারা মানুষ এই বিশ্বসংসারে জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন ও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নির্ম্মল সন্তোষ লাভ করেন। অসঙ্খ্য প্রকার বর্ণবিশিষ্ট মেঘমালার মনোহারিণী শোভা; নবপল্লবিত ফলভারাবনত বিশাল বৃক্ষ সমূহ, নানা প্রকার সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সুখকর সুগন্ধপরিপূরিত মনোহর পুষ্পগুচ্ছসমন্বিত লতাপুঞ্জ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপ-শ্রেণী; অসঙ্খ্য প্রকার পশুপক্ষিগণের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, রূপ ও গঠনের মাধুরী ও সৌন্দর্য্য; নদীনির্ঝর ও কুণ্ডাদির স্বচ্ছ সলিল, সেই সলিল প্রবাহের কল কল ধ্বনি, সূর্য্য কিরণে তাহার চাকৃচিক্য এবং তন্মধ্যে অশেষবিধ রমণীয় বর্ণভূষিত

মৎস্যাদি জল-জন্তুগণের অঙ্গসঞ্চালন ও ইতস্ততঃ অক্লেশে সন্তরণ; প্রাতঃকালের অপূর্ব্ব তাম্রবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল ও শিশির-সিক্ত দূর্ব্বাদল, নিশিতে সুধাময়করসংযুক্ত নিশানাথের নয়নতৃপ্তিকর শোভা ও মেঘাবৃত আকাশ-মণ্ডলস্থ উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট অচিরস্থায়ী বিদ্যুন্মালার জ্যোতিঃ দেখিয়া কাহার মনে অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময় উদয় না হইয়া থাকে! কিন্তু যখন তাহাদের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বভাব, গুণ ও সাধকতা এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়, তখন এই আনন্দ ও বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

প্রাকৃতিক আলোচনাতে চেতন পদার্থের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা অর্থাৎ অনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দজনক ও হিতকর। প্রথমতঃ যে সকল জন্তু সতত আমাদিগের সংসর্গী হইয়া নয়নপথে থাকিয়া জনসমাজের নানা প্রকার হিতসাধন করিতেছে, তাহাদিগের তত্ত্বাবগত হওয়া উচিত; পরে দূরবর্ত্তী ও অপরিচিত পশুদিগের বৃত্তান্ত শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কুক্কুর, ঘোটক, বিড়ালাদি পশুবর্গ সর্ব্বদা আমাদিগের সমক্ষে কত প্রকার ধর্ম্মের পরিচয় দেয়, কিন্তু আমরা প্রায়ই অনবধানতা প্রযুক্ত তাহাতে দৃষ্টিপাত করি না। ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণ অবগত হইলে আমরা ইহাদিগের প্রতি সমধিক যত্ন ও সদ্ব্যবহার করি, এবং আমাদিগের পরিচর্য্যার জন্য এই সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জগৎস্রষ্টার প্রতিও কৃতজ্ঞ চিত্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হই। এই সকল জীবের

জন্ম, মরণ ও বৃদ্ধি, ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, আহার-দ্রব্যের ভালমন্দ বিচার, শাবকগণের প্রতি স্নেহ ও স্বস্ব জীবন-রক্ষার উপায় অবধারণ ইত্যাদি বিষয় সকল মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করা উচিত ; অনন্তর বন্য ও দূরদেশবাসী জীববর্গের তত্ত্ব জানা আবশ্যক। হস্তির সহজে শিক্ষা করিবার শক্তি ; দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র ও হায়ানা নামক পশুর ভয়ানক স্বভাব; উষ্ট্রদিগের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সহিষ্ণুতার আশ্চর্য্য শক্তি ; গণ্ডার ও মহিষগণের প্রবল পরাক্রম ; এই সকল আলোচনা অতিশয় আনন্দজনক। এক এক প্রকার জন্তুর এক একটী বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতে, তত্তৎ জন্তুসম্বন্ধে আমাদিগের মনে বিশেষ বিশেষ কৌতূহল জন্মে, এবং সেই কৌতূহলের বশম্বদ হইয়া আমরা যত জানিবার চেষ্টা করি, ততই নবনব বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। আমরা এই অনুসন্ধান দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে, বিশ্বস্রষ্টা পৃথিবীর যে অংশে যে জাতীয় জীবের সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহারা সেই সেই স্থানেরই নিতান্ত উপযুক্ত, স্থানান্তর হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিয়োগ হইতে পারে। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, সেই ভুতভাবন ভগবান জীবকুল রক্ষার্থে অনির্ব্বচনীয় করুণা-সহকারে দুর্দ্দান্ত ও ভীষণস্বভাব পশুদিগের সঙ্খ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা অনেক অল্প করিয়াছেন, ও যেখানে মানবাদির সমাগমের কোন সম্ভাবনা নাই, এমন ভয়ঙ্কর গহণ কাননে বা নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে তাহাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

চতুষ্পাদ জন্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া, পরে পরম শোভাকর সুমধুরস্বরনিদানভুত শান্তস্বভাব পক্ষিজাতির বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। প্রথমে পক্ষিজাতির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যায় যে, সচরাচর যে সকল পক্ষী বিবিধ মনোহর বর্ণে বিভূষিত, প্রায় তাহাদের সুমধুর স্বর শ্রবণ করা যায় না, আর যাহারা সুমিষ্ট স্বরে গান করিতে পারে, তাহাদের স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শুক-পক্ষীদিগের ও শিখিকুলের নানা প্রকার সুন্দর বর্ণ ও অত্যদ্ভুত শারীরিক গঠন অবলোকন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু তাহাদের মধুর স্বর নাই। আবার কোকিলাদি কতগুলি পক্ষিজাতির এরূপ আশ্চর্য্য স্বর যে, দূর হইতে তাহাদিগের কণ্ঠবিনিঃসৃত সুললিত মধুময় গান শ্রবণ করিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু তাহাদের ময়ূরাদির ন্যায় স্বরূপ দেখা যায় না। জগৎপাতার কি অদ্ভুত কৌশল! তিনি এমনি এক একটী পক্ষীকে এক একটী গুণে বিভূষিত করিয়াছেন যে, তদ্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে হয়; তাহাদের অন্য কোন গুণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় না। পক্ষিজাতির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, জল ও স্থল এই উভয় ভূতই কি অদ্ভুত নিয়মানুসারে তাহাদের নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। হংস, সারস প্রভৃতি কতগুলি বিহগজাতি যেমন ভূপৃষ্ঠে অনায়াসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ আধার সলিলোপরি অতি সহজে সন্তরণ করিতে পারে।

পরমেশ্বর পক্ষিগণের শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে যে রূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে যে অঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে হয় বলিয়া, পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীর ঠিক একখানি তরণিস্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ডস্বরূপ, পুচ্ছ কর্ণস্বরূপ এবং বক্ষস্থল নৌকার পুরোভাগস্বরূপ। শরীর ভারী হইলে, তাহারা আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদের অঙ্গ সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অস্থূল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলে প্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ীর মন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হয়। পরে তাহাদের চঞ্চু, পাখা ও পুচ্ছ ইত্যাদি বিবিধ অঙ্গের অশেষবিধ নির্ম্মাণ-কৌশল, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার ও সুপরিষ্কৃত কুলায় নির্ম্মাণ করিবার শক্তি, শাবকগণের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি অসঙ্খ্য ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিলে অপার আনন্দসাগরে ভাষিতে হয়।

বিহঙ্গম জাতির একে বাহ্য শোভা দেখিলেই মোহিত হইতে হয়, আবার তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও সংস্কার-ঘটিত তত্ত্ব সকল জানিতে পারিলে চিত্ত যে কি পর্য্যন্ত প্রফুল্লিত হয় তাহা বলা যায় না।

পক্ষিজাতির বিবরণ অবগত হইলে পর কুম্ভীর, সর্পাদি সরীসৃপ জাতীয় জীব সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে মনোহর নহে, অধিকন্তু পরানিষ্টকারী, সুতরাং তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি ইহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রীতিলাভ করেন। ভয়ঙ্কর কুম্ভীর, তীক্ষ্ণবিষসংযুক্ত আশীবিষ, চঞ্চলস্বভাব মণ্ডুক, নির্ব্বিরোধ কচ্ছপ প্রভৃতি জীববর্গের বৃত্তান্ত অবগত হইলে আমরা স্থির জানিতে পারি যে, যাহার শরীরে যে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নিহিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহাই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ও হিতকর, এমন কি সেই সেই ধর্ম্ম না থাকিলে তাহার সুখে কালযাপন করার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইত। এই শ্রেণীস্থ জীবদিগের মধ্যে যে জাতি অনিষ্টকারী, করুণাময় বিশ্বপাতা সেই সেই জাতির সঙ্খ্যা অনেক ন্যূন করিয়াছেন। সর্প জাতিরা অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু যখন আমরা ভাল রূপে ইহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখন অশেষবিধ সুন্দর ও সুচিক্কণ বর্ণবিশিষ্ট উরগজাতি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে, আরো দেখিতে পাই যে, অনিষ্টকারী অপবাদ আছে বটে, কিন্তু অনেক জাতীয় সর্প বিনাদোষে হিংসায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকের পক্ষে এই অপবাদ নিতান্ত অমূলক, যেহেতুক তাহাদের বিষ নাই। সরিসৃপ জাতীয় প্রাণিগণের বিবরণ অপ্রীতিকর হইলেও ইহাদের সৃষ্টিতে জগদীশ্বরের এত আশ্চর্য্য কৌশল বিস্তারিত আছে, যে তাহাদের অনুসন্ধানে প্রাকৃতিক

ইতিবেত্তার শ্রম ও আয়াস অশেষ প্রকারে সার্থ হয়।

সরীসৃপ জাতির অনুসন্ধানের পর প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার জ্ঞাতব্য বিষয় মৎস্য জাতি। এই জাতির নিবাসস্থান জল। মৎস্যদিগের জলের সহিত কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! অপর জীবের যে জলে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণবিয়োগ হয়, মৎস্যজাতি অতলস্পর্শ গভীর সাগরগর্ভে সেই জলের মধ্যে পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। বিবিধ প্রকার মৎস্যজাতির শারীরিক গঠন, বিস্ময়কর শরীরাভ্যন্তরস্থিত বায়ুকোষাদি নানা প্রকার যন্ত্র কি পরিপাটী রূপে যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত হইয়াছে! অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য অণ্ড প্রসবের নিয়ম কি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার! এই সকল আলোচনাতে আনন্দ উপস্থিত হয়। মৎস্যগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া সাগর, নদী বা সরোবরের তীরে উপনীত হয় ও মধ্যে মধ্যে মস্তকোত্তলন করিয়া উপরের বায়ুরাশী হইতে বায়ুগ্রহণ করে, বা আহারের দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে কি মনোহর! মৎস্যের শারীরিক শোভা অতি চমৎকার! কোন কোন জাতির শরীর এরূপ সুন্দর বর্ণে আবৃত, যে তাহা যত বার দেখা যায়, তত বারই নূতন বলিয়া বোধ হইতে থাকে ও দেখিবার জন্য নয়নদ্বয়ের প্রতি বারই নবীন অনুরাগ উপস্থিত হয়। তাহাদিগের শারীরিক সৌন্দর্য্যই যদি এত মনোরম্য হইল, তবে তাহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিলে আমাদিগের চিত্ত যে কি অপরিসীম আনন্দের আধার হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

প্রঃ ৩৯৩
১৭/৭/৩৮

মৎস্যজাতির জ্ঞানলাভ সমাপ্ত হইলে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তা পতঙ্গ ও কীট জাতি সম্বন্ধীয় অসীম বিস্তারিত জ্ঞানসাগরতটে উপনীত হন। সহস্র সহস্র বৎসর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অশেষ আয়াস ও শ্রমসহকারে একান্ত চিত্তে এই বিষয়ের অভ্যাস ও আলোচনা করিয়া ইহার শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধ্য মতে যত দূর জানা যাইতে পারা যায়, মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা জানিতে চেস্টা করিলে বিশ্বপতির অসীম কৌশলের সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও তাহার প্রত্যেক পত্র কোন না কোন পতঙ্গজাতিতে পরিপূর্ণ আছে। এই বৃক্ষ ও পত্রে তাহারা যুগপৎ বাসস্থান ও ভক্ষ্য দ্রব্য লাভ করে। তাহাদের অধিকাংশকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দর্শন করিতে পারা যায় না। ইহাদের সকল জাতিই অণ্ডজ। অনেকানেক পতঙ্গজাতি শরীরের পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ করে। প্রজাপতি জন্মাবধি পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় যে, সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার এক একটী কীট একত্রে সংগ্রহ করিয়া নিরীক্ষণ করিলেও কোন ক্রমেই তাহাদিগকে একজাতীয় বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পতঙ্গজাতির বাহ্য শোভা যে কত রূপ তাহা বলা যায় না। কোন কোন পতঙ্গজাতি দিবাভাগে প্রভাহীন সামান্য মক্ষিক বা কীটের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু নিশাকালে উজ্জ্বল দীপের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে বা বৃক্ষোপরি জগৎপাতার কৌশল-

ফণা বিস্তার করিয়া থাকে। আবার কোন কোন পতঙ্গজাতি নানা বর্ণে ভূষিত সুপরিস্কৃত কাচের ন্যায় মনোহর শোভা-বিশিষ্ট ও কোন কোন জাতি উজ্জ্বল স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট; ইহাদের অশেষবিধ বাহ্য শোভা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আবার ইহাদের শরীরাভ্যন্তরের কৌশল যত জানা যায়, ততই আমাদের জ্ঞাননয়ন বিস্ফারিত ও আনন্দপ্রবাহ বর্দ্ধমান হইতে থাকে। পতঙ্গজাতির ন্যায় কীটজাতিরাও পৃথিবীর সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহারা মরুভূমিস্থিত অসঙ্খ্য বালুকাকণার ন্যায় আমাদের পানীয় জল, আহারদ্রব্য ও অবনীমণ্ডলের সকল অংশেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারা চক্ষুর অগোচর ষৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও বিশালাকৃতি পশুদিগের ন্যায় জীবনের নানাবিধ সুখভোগে বঞ্চিত নয়। বিশ্বস্রষ্টা পরমাশ্চর্য্য কৌশলসহকারে তাহাদের শরীর ও বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বহুবিধ ভোগের অধিকারী করিয়া দিয়াছেন, স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধিরও আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। কীট ও পতঙ্গজাতি অবলোকন করিলে কাহার মনে সেই বিশ্বপিতার মহিমা জাজ্বল্যতর রূপে প্রতিভাত ও তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস না হয়।

কীটপতঙ্গ জাতির পর শঙ্খ, শম্বুক ও ঝিণুকাদি সাগরগর্ভস্থিত কঠিন ত্বকবিশিষ্ট অদ্ভুত প্রাণীর ইতিহাসে প্রাকৃ-

তিক ইতিবেত্তার মনকে আকর্ষণ করে। জগদীশ্বর তাহাদের গাত্রাবরণের সুদৃঢ় ত্বকে যে কি অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন জাতির উপরিস্থিত ত্বক এরূপ বিবিধ মনোহর উজ্জ্বল বর্ণে আবৃত, যে তাহাতে দ্রষ্টা অনায়াসে নিজের প্রতিরূপ দর্শন করিতে পারে। এই শ্রেণীস্থ প্রাণীদের মধ্যে কোন কোন জাতি একবারে নিশ্চল স্বভাব, তাহারা সকলেই একস্থানে এরূপ একভাবে অবস্থিতি করে, যে কোন মতেই তাহাদিগকে সজীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু জগৎপাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল! তাহারা সেই ত্বগভ্যন্তরেও আপন আপন জীবনক্রীয়া সম্পাদন করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। ত্বকটী তাহাদের আবাসস্থান ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রের কার্য্য করে। এই ত্বগভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্ম্মাণকৌশল, জীবনক্রিয়া সম্পাদনের পরমাদ্ভুত নিয়ম প্রভৃতি যত প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, সমুদয় অবগত হইতে পারিলে আমাদিগের মনোমধ্যে জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে থাকে।

স্বভাব ভাণ্ডারের সর্ব্ব প্রকার সচেতন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলব্ধ হইলে, উদ্ভিজ্জসৃষ্টি প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধায়ীকে আহ্বান করিতে থাকে। উদ্ভিজ্জ বিদ্যার পর ভূগর্ভনিহিত বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তর তত্ত্ববিদের পথে উপনীত হয়, ও সেই মহান্ পুরুষের অপার জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিয়া তত্ত্ববিদ্‌কে পরিতৃপ্ত করে। অনন্তর তত্ত্ববিদ্ ভূলোক হইতে

দ্যুলোকে আরোহণ করিয়া অসীম শূন্যমার্গে ঘূর্ণায়মান অসঙ্খ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের জ্ঞানলাভে মনকে নিয়োজিত করেন। কত কোটি কোটি নক্ষত্র শূন্যমার্গে নিয়ত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অগণ্য গ্রহগণ আবার তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে অনন্তকাল প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, ও মধ্যেমধ্যে ধূমকেতুগণ গগণমার্গে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই ধূমকেতুগণ কোন্ পথে বিচরণ করিতেছে এবং কি নিয়মের অধীন হইয়া বিধাতার কোন্ অভিপ্রায় সাধন করিয়া ফিরিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? এই যে এক সূর্য্য আমরা দেখিতে পাই, ইহার সদৃশ ও ইহা অপেক্ষা শতসহস্র গুণে বৃহত্তর কত অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য সূর্য্যসম জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ অসীম শূন্যময় স্থানে অবস্থান করিতেছে। এই সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র ও ধূমকেতুগণের আকার প্রকার তেজঃ স্বভাবের তারতম্যের বিবিধ কারণ, ইহারা কি উপাদানে নির্ম্মিত, গগণমণ্ডলে ঘূর্ণায়মান্ বা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবার অত্যাশ্চর্য্য নিয়ম, ইত্যাদি বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য, কি হয়ত অসাধ্য; কিন্তু বিধাতা মনুষ্যকে যে পরিমিত জ্ঞানালোকসম্পন্ন করিয়াছেন; তাহার সহায়তায় এই দুর্জ্ঞেয় অনন্ততত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানা যায়, তাহাতেই আমাদিগের চিত্ত কত উন্নত হয় ও কেমন অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত ব্যাপার সমুদায় যত আলোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। অনবরত চিন্তা করিলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের

সীমা প্রাপ্ত না হইয়াঅবশেষে আমাদিগের সবিস্ময়-চিত্ত ক্রমেক্রমে ভ্রমপথে পতিত হয়, কিন্তু যদি আমরা এই প্রকাণ্ড কাণ্ড চিন্তা করিতে করিতে সেই অখিলনাথের প্রতি লক্ষ্য রাখি, তবে চিন্তার কুটিল জাল হইতে মুক্ত হইয়া সত্যের পথে উঠিয়া সেই লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারি।

THE ... CALCUTTA ...

বটবৃক্ষ।

বটবৃক্ষ ! তুমি হও তরুকুলপতি।
দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় তোমার জীবন।
তব সম মহাকায় কেহ নাহি আর,
সুগভীর ভাব তুমি করহ ধারণ।

তরুরাজ ! নানা দিকে বাহু প্রসারিয়া
সুপ্রশস্ত ভূমি তুমি কর অধিকার।
উত্তাপিত জীবগণে কর সুশীতল,
শ্রান্ত পথিকের হও বিশ্রাম আগার।

শুনিয়াছি পুরুভুজ নামে আছে প্রাণী,
তার কলেবরে জন্মে নব কলেবর ;
তব জটাকার মূলে জন্মে নব দেহ,
তুমি কি কুটুম্ব তার ওহে তরুবর ?

সুদীর্ঘ অশ্বত্থ তরু বিখ্যাত ভারতে,
তাহারেও তব বক্ষে ধর স্নেহ ভরে ;
সুগন্ধি মাধবী লতা বসন্তের সখী,
তোমারে প্রিয়ের সম আলিঙ্গন করে।

কিবা শোভে তব ফল পল্লব ভিতরে,
শুকপক্ষিচঞ্চুসম সিন্দূর বরণ।
কেমনে জন্মিলে তুমি ক্ষুদ্রতর বীজে ?
বিধির অদ্ভুত সৃষ্টি বুঝে কোন্ জন।

তুমি কি জন্মিয়াছিলে বৃক্ষাদির আগে ?
যখন ধরণী জলে ছিল ভাসমান।
পুরাণের এই কথা আছে সুবিদিত,
তব পত্রে নারায়ণ ছিলেন শয়ান।

গয়াতে অক্ষয় বট তব একরূপ,
দূরদেশাগত লোকে করে আরাধন।
নানা গ্রামে নারীগণ তব শুভ তলে,
ষষ্ঠী, পঞ্চানন পূজে মঙ্গল কারণ।

বটবৃক্ষ ! তুমি হও জীবের আশ্রয়,
তোমার দর্শন যোগ্য নহে ছাগ বলি,
তাহা কি হেরিয়া ওহে সদয় পাদপ
শোকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তোমার হৃদয় ?

এঃ গেঃ। শ্রীবনমালী ঘোষ। ভাণ্ডারহাটী স্কুল।

মধুমক্ষিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মধুমক্ষিকার বিষয় বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বতন ইহুদিজাতির মধ্যে উহার গুণগ্রাম অবিদিত ছিল না, এবং গ্রীশদেশীয় জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত আরিষ্টটলও উহার প্রকৃতি নিরূপণে অল্প সময় যাপন করেন নাই; কিন্তু ফ্রান্‌শিস্ হিউবর জন্মগ্রহণ না করিলে, অদ্যাপি উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইত কি না সন্দেহস্থল। ঐ মহাত্মা অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসামান্য গুণবতী দেবদুর্লভ ভার্য্যার সাহায্যে, তিনি যে সমস্ত অপরিজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। অস্মদ্দেশীয় কোন মহাত্মা মধুমক্ষিকাসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু আমাদিগের আদিরসপ্রিয় পণ্ডিত মহাশয়েরা যে ঈদৃশ সামান্য পতঙ্গের প্রকৃতি তত্ত্বানুসন্ধানার্থ বৃথা সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, ইহা সম্ভাবিত বোধ হয় না। ইংরাজী ভাষায় বাইবেল প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, আধুনিক অতি সামান্য পুস্তক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র মধুমক্ষিকা কর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত আছে, এবং মধুপের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইংরাজেরা শিশুদিগকে শ্রমশীল হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের বর্ণনাস্থলে, ঐ মধুমক্ষিকা কখন অলি নামধারণ করিয়া নবনায়কের এক মাত্র উপমা-স্থল হইয়া রহিয়াছে, কখন বা ষট্‌পদ নামগ্রহণপূর্ব্বক

গুণগুণ শব্দে বর্ণনায় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, কখন বা দুরন্ত মধুকর রূপে বিকশিত কুসুমভ্রমে শকুন্তলা প্রভৃতির মুখকমলে উপবেশন করিবার উপক্রম করিয়া দুষ্মন্ত প্রভৃতিকে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছে।

মধুমক্ষিকার হুল কি আশ্চর্য্য বস্তু! উহা খর্ব্ব, সুতরাং অত্যল্পমাত্র বিষধারণ করে, কিন্তু সেই অত্যল্প বিষ কি প্রখর, উহার অগ্রভাগ কি সূক্ষ্ম, এমন কি যে সমস্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সূচীর অগ্রভাগ এক বুরুলের চতুর্থাংশ পরিমিত স্থূলাকৃতি দৃষ্ট হয়, সে যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেখিলেও মধুমক্ষিকার হুলের কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধ হয় না। পেলি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি মধুমক্ষিকার হুলে বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাহা অন্য কোন সৃষ্টপদার্থেই বিদ্যমান নাই বলিতে হইবে। উহার পাঁচটী চক্ষু, বক্রাগ্র ও থলিযুক্ত পাগুলি, অদ্ভুত স্পর্শ-শক্তিসম্পন্ন শুঁয়াগুলি কি কৌশল প্রকাশ করিতেছে! মধুক্রম নির্ম্মাণে উহারা কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, ও বিশুদ্ধ গণিতের শেষ প্রতিজ্ঞাসাধ্য প্রণালীতে একএকটী নিবাসকোষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, কিন্তু এতৎ সমুদায় বর্ণন করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এসমস্ত বর্ণন করিতে হইলে এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে, অতএব এস্থলে আমরা মধুমক্ষিকার কি রূপ প্রকৃতি তাহারই কিছু কিছু বর্ণনা করিব।

মধুক্রমে তিন প্রকার মধুমক্ষিকা থাকে। কর্ম্মকর [১], পুরুষজাতি [২], প্রসূতি [৩]।

একএক ক্ষৌদ্রে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার মক্ষিকা থাকে, তাহার মধ্যে ত্রিশভাগের এক ভাগ পুরুষ, একটী মাত্র স্ত্রী [প্রসূতি], এবং অবশিষ্ট সমুদায়গুলি কর্ম্মকর। কর্ম্মকর মক্ষিকারা পূর্ব্বে ক্লীব বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইতেছে যে,তাহারা অপরিস্ফুটলিঙ্গ স্ত্রীজাতি। কর্ম্মকর মক্ষিকারাই মধুক্রম নির্ম্মাণ, মধূত্থ সৃষ্টি ও সন্তান-পালন করিয়া থাকে। পুরুষজাতি অপেক্ষাকৃত স্থূল কায়, বংশপ্রবাহ রক্ষা করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য, এবং সেই কার্য্য সাধিত হইলেই তাহারা নিহত হয়। প্রসূতি-মক্ষিকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি, তাহার অণ্ড প্রসব করা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম নাই। পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তির পাঁচ দিন পরেই প্রসূতি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, এবং যত দিন শীতের প্রাদুর্ভাব না হয়, অবিশ্রামে উক্ত কার্য্য করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই শত করিয়া ডিম পাড়ে।

প্রসূতীমক্ষিকা কি রূপে গর্ভবতী হয়, পূর্ব্বে এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের অনেক মতভেদ ছিল। কেহকেহ অনুমান করিতেন যে, মৎস্য প্রভৃতির ডিম্বের ন্যায় উহার ডিম্ব গর্ভ হইতে বহির্গত হইলে পর, পুরুষের স্পর্শে সজীব হয়। কিন্তু হিউবরের পরীক্ষার পর এবিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করি-বার কথা নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন, প্রসূতিমক্ষিকা ক্ষৌদ্রমধ্যে থাকিয়া কখনই গর্ভবতী হয় না। অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ইহাদেরও উড্ডয়নাবস্থায় গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। ক্ষৌদ্রমধ্যে একটী মাত্র স্ত্রী, অতএব এত অধিক

পুরুষের আবশ্যকতা কি, ইহাও অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু হিউবর যে মত উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্বারা ইহার তাৎপর্য্যও অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। উড্ডয়ন কালে কে কোথায় ছুট্‌কিয়া পড়ে তাহার ঠিকানা থাকে না, যদি পুরুষসংখ্যা বিরল হইত, তবে এই কালে স্ত্রীপুরুষে একত্র সাক্ষাৎ প্রায় ঘটিত না। এই নিমিত্ত অধিক সংখ্যক পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, যে কোন না কোন পুরুষের সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইবেই হইবে। পুরুষেরা মধুক্রম ত্যাগ করিয়া বহির্ভাগে গমন করিলেই প্রসূতিমক্ষিকা তাহাদের সঙ্গেসঙ্গে বহির্গত হয়। একবার মিলিত হইলেই তাহার গর্ভসঞ্চার হয়, এবং ক্রমাগত দুই বৎসর কাল ডিম পাড়িতে থাকে। গর্ভাধানের ছয়চল্লিশ হোরার পর ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। প্রথম এগার মাস নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মকরপ্রভব ডিম্ব প্রসব করে, তদনন্তর পুরুষ-প্রভব ও পরিশেষে প্রসূতিপ্রভব ডিম্ব প্রসব করে। প্রসূতিপ্রভব ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে, কর্ম্মকর মক্ষিকারা তাহা জানিতে পারিয়া ভাবী প্রসূতীমক্ষিকার বাসোপযুক্ত কোষ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়।

কর্ম্মকর-প্রভব ডিম্ব প্রসব করিবার পূর্ব্বে প্রসূতী কোষগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে। যদি তাহাতে কোন দোষ না থাকে, তবে এক একটী কোষে এক একটী ডিম পাড়িয়া যায়। ডিমগুলি চতুর্থ দিনে ফুটিয়া উঠে এবং তদুৎপন্ন কীট দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময় ধাত্রীরা আসিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত আহার প্রদান করিতে আরম্ভ

করে। কীটগুলি পাঁচ দিনের পর আর আহার করে না, তখন ধাত্রীরা কোষের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কীটগুলি তখন মুখ হইতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম রেশমের সূত্র দ্বারা আপনাদের শরীর পরিবেষ্টিত করে। ছত্রিশ হোরার মধ্যে ঐ বেষ্টনক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ইহার তিন দিন পরে তাহারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে ডিম্ব স্থাপিত হইবার কুড়ি দিন পরে, কোষের দ্বার কাটিয়া পরিণত মক্ষিকাকারে বহির্গত হয়। পুরুষপ্রভব ডিম্বেরও অবিকল ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে, কেবল এই মাত্র বিশেষ যে, উহারা চব্বিশ দিনে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রসূতি এগার মাস কর্ম্মকর-প্রভব অণ্ড প্রসব করিলে পর পুরুষ-প্রভব ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রসূতিমক্ষিকা কোন কারণে জন্ম গ্রহণের পর, বিংশতি দিবসের মধ্যে যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তাহার সমুদায় অণ্ড হইতেই পুরুষ জন্মে। প্রসূতিমক্ষিকার সংস্কার এত প্রবল যে, তাহার নিজের দোষে কখন এরূপ অনৈসর্গিক ফলোৎপত্তি হয় না, এমন কি যদি বল প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে কুড়ি দিনের অধিক বন্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে সে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া বহির্গমনচেষ্টা করে।

প্রসূতি-প্রভব অণ্ডগুলি যে রূপ মক্ষিকাকারে পরিণত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অপেক্ষা আশ্চর্য্য। ধাত্রীরা ঐ অণ্ডগুলির লালনপালন বিষয়ে সমধিক যত্ন করে, এবং ষোল দিনের মধ্যেই তাহারা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কর্ম্মকর ও পুরুষজাতির ন্যায় প্রসূতী-প্রভব ডিম্বগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তিমাত্র কোষমুখ কর্ত্তন করিয়া বহির্গমন করিতে পায় না। যদি বৃদ্ধা প্রসূতি একবারে মধুক্রম পরিত্যাগ করিয়া যায়, অথবা অন্য কোন প্রকারে প্রসূতির পদ শূন্য হয়, তাহা হইলেই ঐ অভিনব প্রসূতিগুলি বহির্গমন করিতে পায়। ধাত্রীরা প্রসূতিনিবাসকোষগুলি দৃঢ়-তর রূপে বন্ধ করে, কেবল আহার প্রদানের উপযুক্ত একটী সামান্য ছিদ্র মাত্র রাখিয়া দেয়, এবং বৃদ্ধা প্রসূতি স্থানান্তর গমন করিলে, আমাদের কি হইবে, যেন এই ভাবিয়াই ঐ নবীন কায় প্রসূতিদিগকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। বৃদ্ধা স্বাভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে পরিণত বা অপরিণত প্রসূতি-প্রভব কীট দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তদ্বিনাশে প্রবৃত্ত হয়, এই নিমিত্ত ধাত্রীরা কোন ক্রমেই তাহাকে তাহাদের নিকট আসিতে দেয় না। ফলতঃ, প্রসূতিদিগের ঐ অদ্ভুত নৈসর্গিক প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, সদ্য কোষনিঃসৃত প্রসূতিও স্বজাতীয় বধে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক একটী মধুক্রমে এক একটী প্রসূতি থাকে, দুইটী প্রসূতি কদাচ একটী মধুক্রমে থাকিতে পায় না। যে সমস্ত কারণে দুইটী প্রসূতি এককালে এক মধুক্রমে থাকিতে না পায়, তৎসমুদার আলোচনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

প্রথমতঃ, সদ্যোজাত প্রসূতি কোষ হইতে বহির্গত হই-য়াই তদীয় অস্ফুটদেহ ভগিনীগণকে হনন করিতে স্বতঃ

প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং যাহাতে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, এরূপ সৃষ্টিকৌশলও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসূতি-প্রভব ডিম্বগুলি একএক দিন অন্তর প্রসূত হয়, সুতরাং উহারা একএক দিন অন্তর পূর্ণাবস্থাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠাদিগকে বিনষ্ট করিবার সামর্থ্য ও অনেক সুযোগ পাইয়া থাকে। যদি ঘটনাক্রমে দুইটী প্রসূতি যুগপৎ কোষ-মুখচ্ছেদন করিয়া উদ্গত হয়, তাহা হইলে উহারা তৎক্ষণাৎ ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। আর যদি স্থানান্তর হইতে একটী প্রসূতি আসিয়া মধুক্রমে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও ক্ষৌদ্রস্থ প্রসূতি তদ্দণ্ডে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে, এই রূপে এককালে দুইটী প্রসূতি এক ক্ষৌদ্রে থাকিতে পায় না।

অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে, যুদ্ধ প্রবৃত্ত দুইটী প্রসুতিই এককালে নিহত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কদাচ ঘটে না। ঈশ্বরের এমনি কৌশল যে, যুদ্ধে একটী ভিন্ন কদাচ দুইটী মরিবে না, একটীর মৃত্যু হওয়া আবশ্যক, দুইটী মরিলে ক্ষতি হয়, সুতরাং তিনি এক সময়ে দুইটীর মরিবার যো রাখেন নাই। মক্ষিকা-শরীরের উদর ভিন্ন আর কোন অংশই বিদ্ধ হইবার যোগ্য নহে; অতএব যখন দুইটী প্রসূতিমক্ষিকা পরস্পর এবম্প্রকারে পরস্পরকে আক্রমণ করে, যে উভয়েই উভয়ের উদরে স্বস্ব হুল ফুটাইতে পারে, তখন তাহারা আশ্চর্য্য সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত হয়। যখন কোনটী আপনি

নিরাপদ থাকিয়া শত্রুর উদর ভেদ করিতে সমর্থ হয়, কেবল তখনই যুদ্ধকার্য্য চলিয়া থাকে।

কর্ম্মকর মক্ষিকারা মধ্যস্থ হইয়া কখনকখন যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা তাহা না করিয়া বরং রণোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া দেয়। তাদৃশ যুদ্ধে যাহাতে একটী নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ চেষ্টা করে। তাহারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হইয়া উঠে। যদি একটী পলাইবার উপক্রম করে, তাহা হইলে উহারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া পলাইতে দেয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষৌদ্র মধ্যে একটীর অধিক প্রসূতি থাকিতে না পারে, এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর একটী অতি চমৎকার উপায় অবলম্বিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ডিমগুলি কীটাকারে পরিণত হইয়া মুখ হইতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র বহির্গত করিয়া তদ্বারা স্বস্ব শরীর পরিবেষ্টিত করে। কিন্তু প্রসূতিপ্রভব কীট গুলি অন্যান্য কীটের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করে না, অধোভাগের কিয়দংশ অনাবৃত রাখে। হিউবর বলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্যেষ্ঠা প্রসূতি সহজে যবিষ্টের নিধনসাধন করিবে, কেননা যদি কীটগুলি সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় বিনষ্ট করা কঠিন ব্যাপার হইত। বেষ্টনসূত্রগুলি অতি সূক্ষ্ম ও সুসংশ্লিষ্ট, এবং তাহা ভেদ করিয়া জ্যেষ্ঠা কখনই তাহাদের উদরে হুল ফুটাইতে পারিত না। আর যদি কথঞ্চিৎ বেষ্ঠন-

ভেদ করিতে সমর্থ হইত, তথাপি হুলের প্রান্তস্থিত ফলাটী নিষ্ক্রান্ত করা কঠিন হইত সন্দেহ নাই। জীবপ্রবাহ রক্ষার্থ সংসারে যে সমুদায় কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। আবার জীবশ্রেণীর অসঙ্গত বৃদ্ধি নিবারণার্থ তাহাদের যে সমস্ত নিধনোপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তৎ-পর্য্যালোচনা করিয়াও তাঁহারা অনুপম আনন্দ অনুভব করেন।

কোন কারণে প্রসূতি বিয়োগ হইলে ক্ষৌদ্র মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। মক্ষিকারা শীঘ্র ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে না, সুতরাং সকলেই কিয়ৎক্ষণ রীতি-মত স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষৌদ্র মধ্যে এক প্রকার ভোঁ ভোঁ শব্দ উত্থিত হয়। ধাত্রীরা সন্তানপালন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্ত প্রায় হইয়া ক্ষৌদ্রের উপর পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে কি বিপদ্ ঘটিয়াছে। কিন্তু কিরূপে ইহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়? ক্ষৌদ্রের উপরিস্থ মক্ষিকারা কি প্রকারে জানিতে পারে, যে অমুক কোষ্ঠে প্রসূতি নাই, সকলেই কিছু সমুদায় কোষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইসে না। তবে ঐ সময়ে মক্ষিকারা যে পরস্পরের শুঁয়া স্পর্শ করিয়া থাকে, বোধ করি ঐ স্পর্শক্রিয়াদ্বারাই ঐ রূপ শোচনীয় সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। যাহা হউক, সকলেই প্রসূতির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কেহ কেহ বা বেগে বহির্গমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে।

পাঁচ হোরার পর ঐ রূপ গোলযোগ অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। তখন উহারা বিযুক্তপ্রসূতির স্থান পূরণে সচেষ্ট হয়, যদি পরিণত-অবস্থা-সম্পন্ন প্রসূতি কোন কোষ মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকেই মুক্তি দিয়া প্রসূতির পদে অভিষিক্ত করে। তাহার অভাবে যদি প্রসূতি-প্রভব ডিম্ব থাকে, তবে সর্ব্ব প্রযত্নে তারই পোষণ করিতে আরম্ভ করে। যদি অন্য প্রসূতি বা প্রসূতি-প্রভব ডিম্ব না থাকে, কেবল কর্ম্মকর ডিম্বমাত্র থাকে, তাহা হইলে দুই তিনটী কোষ বাছিয়া লয়, এবং ঐ গুলির পাস ভাঙ্গিয়া প্রসূতিবাসোপযোগী বিস্তৃত কোষ নির্ম্মাণ করে। পরে ঐ কীটাকৃতি ক্ষুদ্র কর্ম্মকরগুলিকেই বিশেষরূপে আহারদান দ্বারা প্রসূতি রূপে পরিণত করিয়া তুলে। কর্ম্মকর মক্ষিকারা যে অপরিস্ফুটলিঙ্গ স্ত্রীজাতি বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল, উল্লিখিত ব্যাপারটী তাহার সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে।

কোন ক্ষৌদ্রের প্রসূতিটী স্থানান্তরিত হইলে, তাহার বিয়োগের দ্বাদশ হোরা পরে যদি অপর একটী প্রসূতি আনিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষৌদ্রস্থ সমস্ত মক্ষিকা বেষ্টন পূর্ব্বক তাহার শ্বাসরোধ করিয়া বিনাশ করে। অষ্টাদশ হোরার পর কোন নূতন প্রসূতি আনিয়া দিলে তাহাকে যন্ত্রণা দিয়াই পরিত্যাগ করে, প্রাণে বিনষ্ট করে না। কিন্তু সেই সময়ে তাহাদের পরিচিত প্রসূতিটী পাইলে সকলেই আহ্লাদ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করে। আর যদি চতুর্ব্বিংশ হোরার মধ্যে তাহাদের

পূর্ব্বতন প্রসূতিটী না পায়, তখন যে কোন নূতন প্রসূতি আনিয়া দিলে, তাহাকে আর অপরিচিত প্রসূতির ন্যায় কষ্ট দেয় না, বরং আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করে ও সকলেই তাহাকে মধুপান করিতে দেয়।

কর্ম্মকরমক্ষিকারা কখন কখন অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু অধিক বয়সে গর্ভবতী হইলে প্রসূতিমক্ষিকা যেমন কেবল পুরুষপ্রভব অণ্ডই প্রসব করে, উহাদের অণ্ডগুলি সেই রূপ পুরুষপ্রভব ভিন্ন অন্য প্রকার হয় না। যে ক্ষৌদ্রে প্রসূতি না থাকে, এবং যথায় কর্ম্মকরপ্রভব অণ্ড সকল প্রসূতি-প্রভব করা হয়, সেই ক্ষৌদ্রেই উক্ত ঘটনা হইয়া থাকে, এবং প্রসূতি-প্রভব ডিম্বের আবাসকোষের নিকটস্থ কোষে যে সকল কর্ম্মকরমক্ষিকা থাকে, তাহারা ডিম্ব প্রসবশক্তিসম্পন্ন হয়। ধাত্রিরা যখন প্রসূতিপ্রভব কীটগুলিকে আহার দেয়, তখন সেই সকল ভক্ষ্য দ্রব্যের কিছু কিছু চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলে। বোধ হয় ঐ পুষ্টিকর আহার পাওয়াতে উহাদের অণ্ড প্রসব করিবার ক্ষমতা জন্মে।

গ্রীষ্মকালে মধুমক্ষিকারা মধ্যে মধ্যে ঝাঁক বাঁধিয়া এক একটী প্রসূতিমক্ষিকা সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে গিয়া বাস করে। এই রূপ পরিবর্ত্তিত বসতিকে মধুমক্ষিকার উপনিবেশ বলা যায়। প্রসূতিমক্ষিকা যে দিকে যায় অন্যান্য মক্ষিকারা সেই দিকেই ধাবমান হয়। এমন কি যদি প্রসূতিমক্ষিকাকে ধরিয়া এক স্থানে স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলেও অপর মক্ষিকাগুলি সেই স্থানেই আসিয়া বসিবে। বৃষ্টির সময় প্রায় ঝাঁক উড়ে না।

মধুক্রমে অধিক সংখ্যক মক্ষিকা থাকিলেও গ্রীষ্ম অধিক বোধ হয় না, এবং তথায় বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হয়। কতকগুলি মক্ষিকা কোষের দ্বারদেশে বসিয়া পক্ষসঞ্চালন দ্বারা কোষমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর গতিবিধি সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু কখনকখন গ্রীষ্মাতিরেক বা মধুকর সঙ্খ্যার বৃদ্ধি হইলে মধুক্রম আর বাসোপযোগী থাকে না, তখন কতকগুলি মক্ষিকা দলবদ্ধ হইয়া অন্যত্র উড়িয়া যায়, এই রূপে মধুকরের উপনিবেশ হইয়া থাকে। কখন কখন এক এক খানি মধুক্রম হইতে বৎসরে দুইবার মক্ষিকাদল নির্গত হয়। মক্ষিকাদলের মধুক্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আরও কারণ আছে। বৃদ্ধা প্রসূতি স্বীয় কন্যাগণের দৈনন্দিন বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে ভীত হয় ও অন্যত্র পলাইবার চেষ্টা করে। সে কন্যাগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য বারম্বার তাহাদের কোষের নিকট যায়, কিন্তু ধাত্রিরা কোন মতেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে দেয় না। ধাত্রিরা তখন প্রসূতিকে দংশন করে, ও অন্য রূপে আহত করিয়া দূরে তাড়াইয়া দেয়। ফলতঃ, উপনিবেশের সময় ধাত্রিরা সমধিক যত্নশীল হয়। অন্যান্য সময়ে বৃদ্ধা প্রসূতি স্বীয় কন্যাগণকেও বা প্রথমজাত প্রসূতি স্বীয় ভগ্নীদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে ধাত্রিরা বড় একটা বাধা দেয় না, কিন্তু উপনিবেশ করিবার সময় উপস্থিত হইলে তাহারা কোন মতেই উহাদের দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ করিতে দেয় না। অনেক দল উপনিবেশ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে যাইতে পারে, সুতরাং তখন অনেক প্রসূতিরও প্রয়োজন হইতে

পারে, এই ভাবিয়াই যেন তাহারা সে সময়ে তত সাবধান ও সতর্ক হয়।

কোকিল।

আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাল কোকিল!
তোমার দ্বাদশ মাসে, আতর চন্দন ভাসে,
আন্দোলিত অবিরত বসন্ত অনিল,
যে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন,
সে সময়ে সেই দেশে তব নিকেতন।

আলো করা কাল রূপ নয়ননন্দন।
ভাল রূপ ভাল স্বর, পাইয়াছ পিকবর,
আঁখি শ্রুতি উভয়ের আদর ভাজন ;—
"কোকিল কুৎসিত পাখী" কে বলিল হায়।
কুৎসিত কবিত্বে কবি-অঙ্গ জ্বলে যায়।

আনন্দ প্রফুল্ল মনে করি উন্মীলন,
অরুণ নয়নদ্বয়, যেন রক্ত কুবলয়,
ভাসিতেছে কাল জলে বিকাশী নূতন—
হেরিতেছ অবনীর নব কলেবর,
সরস পল্লবলতা মঞ্জরী মনোহর।

মঞ্জরিল কুঞ্জ তব রসাল শাখায়,
সুরভি মুকুলপুঞ্জ, পরিমাণে ভরে কুঞ্জ,
আবরিত করে কচি কোমল পাতায়,
মন্দমন্দ গন্ধবহ আন্দোলিত হয়,
সুশীতল সুবিরল যেন দেবালয়।

এ হেন নিকুঞ্জে বসি হরিষ অন্তরে,
করিতেছে কুহু রব, শুনিয়া মোহিত সব,
ত্রিদিব-সম্ভব-রব শ্রবণ বিবরে।
সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বসিয়ে,
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাকিয়ে।

এমন পবিত্র স্থানে সুপবিত্র মনে,
বল কলকণ্ঠবর, করি এত সমাদর,
গাইতেছে কার গুণ বিকম্পিত স্বনে;
যে দিল তোমার রবে এমন সুতার,
বিজনে কূজনে পুজা করিতেছ তাঁর।

শৈশবে বসন্তসখা বায়সী তোমায়
সুযতনে সমাদরে, লালনপালন করে,
সন্তান-জীবন-জীবি জননীর প্রায়;
মহা সুখী তব মাতা পিকরাজপ্রিয়া,
পালিল সন্তানে কাকী কিঙ্করীরে দিয়া।

সেবিকা সন্তানে পালে আপন-ভবনে:
তবে কেন বিরহিনী, শুনি কলকণ্ঠ ধ্বনি,
ব্যথিত হৃদয়ে বলে সজল নয়নে,
কাকের পালিত তুই কঠিন হৃদয়,
স্বর শরে বধ নারী নাহি ধর্ম্ম ভয়।

কুহর কুহর পিক সুকোমল কলে,
শুনিয়ে মধুর তান, আনন্দে নাচিছে প্রাণ,
শুন নারে বিরহিণী কাতরে কি বলে—
পাগলিনী বিরহিণী বিষাদে ব্যাকুল,
বিমল সুধায় তাই বিষ বলে ভুল।

তোমার ভোজন হেতু, প্রিয় আয়োজন,
তেলাকুচা লতিকায়, কেমন শোভিছে হায়,
পরিণত বিম্বফুল হিঙ্গুল বরণ।
বামে লয়ে পিকরাজ কর হে আহার,
সকালে ললিত তানে গাইবে আবার।

মানুষের জন্ম।

মানুষের জন্ম অতি আশ্চর্য্য! বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই এক মনুষ্যজাতির সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কত প্রকার ভিন্নভিন্ন কৌশল রহিয়াছে। এক একটী কৌশলে ঈশ্বরের শতসহস্র মঙ্গলাভিপ্রায় দেদীপ্যমান্

রহিয়াছে। এক একটী অভিপ্রায়েও আবার জীবলোকের শতসহস্র সুখশ্রেণী জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে। প্রতি মানুষেরই মুখশ্রী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, বোধ হয় এমন দুই জন দৃষ্ট হয় না যাহাদিগের মুখশ্রী এক প্রকার। মানুষের আকৃতিগত এই অসৌসাদৃশ্যই সমাজ-সুখের মূলীভূত। এই প্রাকৃতিক নিয়ম সামাজিক সুখের ও সাংসারিক ব্যবস্থার মূলকারণ। যদি ভিন্নভিন্ন না হইয়া সকল মনুষ্যেরই মুখশ্রী সমান হইত, তবে এই সুখপূর্ণ পৃথিবী কি অসুখের স্থান হইয়া উঠিত বলা যায় না। স্নেহময় জনকজননী পুত্রকন্যাদিগকে চিনিতে পারিতেন না; তাহাদের লালনপালন বা শিক্ষাসাধনের অনেক ব্যাঘাত ঘটিত। কেহই শত্রুমিত্র ভেদ করিতে পারিত না; সংসারে দুঃখই সুলভ ও বন্ধুতাসুখ একবারে অতি দুর্লভ হইত। আর অমূল্য দাম্পত্যসুখও কেহ অনুভব করিতে পারিত না; দম্পতীর পরস্পর সৎভাব ও সৎভাবনিবন্ধন সুসন্তানোৎপাদনের ব্যতিক্রম ঘটিত সন্দেহ নাই। কে কাহার্ পিতামাতা, কে কাহার্ পুত্রকন্যা, কে কাহার্ স্বামীস্ত্রী, মানুষের এ সকল চিনিয়া উঠাই ভার হইত। ফলতঃ, এরূপ হইলে সমাজ ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতার এবং সংসার নিরবচ্ছিন্ন কষ্টের স্থান হইয়া উঠিত তাহার আর সন্দেহ নাই। ভিন্নতা ও তারতম্যই সকল বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞানের মুলীভূত। যে বিষয়ের ভেদ ও তারতম্য থাকে, সেই বিষয়েরই ভালমন্দ বিবেচনা হয়। পরমেশ্বর মানুষের এই একমাত্র মুখশ্রী ভিন্ন ভিন্ন করাতে;

রূপলাবণ্যের গৌরব, এবং সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হইয়াছে।

মানুষের স্বভাবও অতি আশ্চর্য্য! প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রী যেমন ভিন্নভিন্ন, প্রত্যেকের স্বভাব বা মনের গতিও তেমনি স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। এই নিমিত্তেই পৃথিবীর সৃষ্টি-কালাবধি মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মাধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে; মতবিরোধ অপ্রতিহতরূপে চলিয়া আসিতেছে; এক বিষয়ে নানা লোকের নানা মত প্রকাশিত হইতেছে; তাহার সঙ্গেসঙ্গে মনুষ্যসমাজের অবস্থাও ক্রমেক্রমে উন্নত হই-তেছে। মানুষের মনের গতি পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতে সমা-জের যার পর নাই উপকার হইতেছে।

পরমেশ্বর সকল বিষয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি লোকের ভাষাশক্তি অতি প্রবল হয়। কেহ শিক্ষা না দিলেও তাঁহাদের মন কেবল সাহিত্য-শাস্ত্রের আলোচনাতেই আশক্ত হয়। জীবিতকাল তাঁহারা কেবল সেই সাহিত্যশাস্ত্রেরই শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। কতক-গুলি মানুষের মন সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুরোধে জন্মাবধি কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্রের দিকেই আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের সাহি-ত্যশাস্ত্রে মন প্রবিষ্ট হয় না; কাব্য পড়িয়াও আমোদ বা তৃপ্তি জন্মে না। তাঁহারা কাব্যনাটক অমূলক ও অপ্রামা-ণিক বলিয়া তৎপ্রতি হাস্য করেন। তাঁহারা চিরকাল বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া কেবল তাহারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে জীবন যাপন করেন। কতকগুলি লোকের স্বভা-বতঃ শিল্পশাস্ত্রের প্রতিই অনুরাগ থাকে। অন্যান্য শাস্ত্রে

তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন থাকে না। শিল্পীদের সহিত আলাপপরিচয়, শিল্পযন্ত্রের আবিক্রিয়া, শিল্পশাস্ত্রের পর্য্যালোচনাতেই তাহাদের জীবিতকাল পর্য্যবসিত হয়। এই রূপে প্রায় সকল মানুষই ভিন্নভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ভিন্নভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে; এবং তাহার সঙ্গেসঙ্গেই মনুষ্য সমাজে দিনদিন শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, এবং ব্যবহারপ্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়া সাংসারিক সুখের বৃদ্ধি হইতেছে। এই সকল প্রকার কার্য্যেই মানুষের মনের ভিন্নভিন্ন গতি প্রকাশ পাইতেছে। পরমেশ্বর মানুষের মনের গতিকে এই রূপ ভিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়াতে সামাজিক সুখবৃদ্ধির পথ, জ্ঞানলাভের সহজ উপায়, এবং সুখসচ্ছন্দে সংসারযাত্রানির্ব্বাহের সুবিধা হইয়াছে।

কারণ বিনা কার্য্যের কখনই উৎপত্তি হয় না। কারণগুণ কার্য্যে সংক্রামিত হয়। সমুদায় সৃষ্ট পদার্থই এই অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। অতএব, কোন অলৌকিক ঘটনা বা আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া একবারে বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। সহসা বিস্ময়কে হৃদয়ে স্থান দিলে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত ও বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। বিস্ময়াভিভূতচিত্তের কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত করিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু যদি বুদ্ধিকে অবিচলিত ও বিবেচনাকে অপ্রতিহত রাখিয়া সেই অলৌকিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তবে অবশ্যই তাহার একটা না একটা কারণ প্রকাশ পাইবে। তখন

সে বিস্ময়বুদ্ধি দূরগত হইবে ; কারণ বিনা কার্য্য হয় না, স্পষ্ট বোধ হইবে, এবং তাহার সঙ্গেসঙ্গে মনের ভ্রম-প্রমাদও দুরীভূত হইবে। রাজার রাজনিয়মানুসারে রাজ্য যেমন শাসিত ও পালিত হয়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমুদায় সৃষ্টপদার্থও তেমনি শাসিত ও পালিত হইতেছে। সংসারের কোন বিষয়ই নিয়মের বহির্ভূত নহে। মানুষের মুখশ্রীর পরস্পর অসৌসাদৃশ্য ও মনোবৃত্তির বিভিন্ন ক্রিয়া দেখিয়া আপাততঃ বড় আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে ; কিন্তু অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে এ সকলেরই কারণ নির্দ্দেশিত হইতে পারে, সকলই বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটি-য়াছে। যে নিয়মের যে ফল, তাহা অবশ্যই ফলিবে। যে কারণ যে কার্য্যের তাহার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না। সংসারে কারণবশতঃ কেহ পরমরূপবান্ সুশ্রীক হইয়া পরিবারবর্গের আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছে ; আর কেহবা কদাকার বিশ্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কারণবশতঃ কেহ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে ; আর কেহ বা কেবল গণিতশা-স্ত্রের আলোচনাতেই জীবন ক্ষয় করিতেছে। কারণবশতঃ কেহ সূক্ষ্মদর্শী সুবুদ্ধি হইয়া জন্মিয়াছে ; আর কেহ বা স্থূলদর্শী নির্ব্বুদ্ধি হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। কারণবশতঃ কেহ দয়ালু হইয়া পরমসুখে সমাজের দুঃখভার বহন করিতেছে ; আর কেহ বা স্বার্থপর নির্দ্দয় হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনেই ব্যতিব্যস্ত আছে। এ সকলই মানুষের শারীরিক মানসিক ও ভৌতিক নিয়মাবলীর ভিন্নভিন্ন ফল-স্বরূপ।

সকল ব্যাপারই পরমেশ্বরের অপরিবর্ত্তসহ ও অনতি-ক্রম্য নিয়মের অধীন। মানুষের জন্মক্রম এই রূপ একটী নিয়মের অধীন। জীবসঞ্চারের সঙ্গেসঙ্গেই মানুষের শুভাশুভের কারণ সঞ্চার হয়, পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত মিথ্যা নহে! বস্তুতঃ, জীব সঞ্চারকালে পিতা মাতা প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে সেই পুণ্য বলে সন্তানের সুখ ও তাহা লঙ্ঘন করিলে সন্তানের দুঃখ হইয়া থাকে। ইদানীন্তন পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের সুখদুঃখাদির কারণ জন্মে। কেবল জনক-জননীই সেই কারণের মূলীভূত। মানুষের জন্মবিষয়ক যে সকল মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপালন করিলেই রূপগুণসম্পন্ন সুসন্তান জন্মে; আর অন্যথাচরণ করিলেই রূপগুণবিকৃত কুসন্তান জন্মিয়া পৃথিবীর দুঃখজঞ্জাল বৃদ্ধি করে। অতএব যাহাতে গর্ভসংস্থানবিষয়ক নিয়মাবলী জানা যায়, এবং গর্ভ পালনবিষয়ক বিজ্ঞতা জন্মে, দম্পতীদের এরূপ বিষয়ে শিক্ষিত ও সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মানুষ এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতেই সুখময় পৃথিবী অনিয়ম-জালে আচ্ছন্ন, দুঃখভারে অবনত ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ কোন বিষয়েই সুখ-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না।

গর্ভসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই অতি আশ্চর্য্য! শারীর-স্থানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, গর্ভের যে স্থানে বীজ পতিত ও অঙ্কুরিত হইয়া সত্ব জন্মে, গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে

তাহাতে বিন্দুমাত্রও কোন পদার্থ ধরে বলিয়া কোন মতেই বোধ হয় না। কিন্তু পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল!—কি নির্ম্মাণদক্ষতা!—কি মহীয়সী শক্তি!—গর্ভ সঞ্চারের সঙ্গেসঙ্গেই গর্ভস্থ সত্বের উপযুক্ত বাসস্থান প্রস্তুত হইতে থাকে। যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর, নিঃসহায় সদ্যোজাত সন্তানের প্রাণরক্ষার্থে পুর্ব্বেই জননীর মাংসশোণিতময় স্তনযুগলে অতি উপাদেয় দুগ্ধ সঞ্চয় করেন, এবং তাহা পালনার্থে জনক-জননীর হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব স্নেহরস সঞ্চার করেন, তিনিই এই নিশ্চেষ্ট জীবের বাসার্থে অগ্রেই ইহার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া দেন। যে আশ্চর্য্য কোষ-মধ্যে গর্ভ সঞ্চারিত ও সত্ব বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম জরায়ু। জরায়ুর অপর নাম গর্ভাশয়। ঐ জরায়ু বা গর্ভাশয়ের ধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য! গর্ভ মধ্যে দিনদিন সত্ব যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সসত্ব জরায়ু বিস্তৃত হয়। গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে উহার যে ভাব থাকে, তাহার পর আর সেরূপ থাকে না। দিনদিন তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়। দিনদিন গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অমনি তাহার সঙ্গেসঙ্গেই জরায়ুর শিরা মাংসপেশী ও অন্ত্র সকল স্থিতিস্থাপক হইয়া উঠে। তাহা ক্রমেক্রমে এরূপ স্থিতিস্থাপক হয়, যে বল-পূর্ব্বক টানিলেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত হয়। গর্ভের এরূপ স্থিতিস্থাপকতা না থাকিলে, সত্বের অবয়বসংস্থান, শরীর বৃদ্ধি ও গাত্রসঞ্চালনের বড়ই ব্যাঘাত হইত। গর্ভ এক নিয়মে অনবরতই বৃদ্ধি হয় না। প্রথম ছয় মাস কালই ইহার বৃদ্ধির মুখ্য কাল। ছয় মাসের পর নয় মাস পর্য্যন্ত

ক্রমেক্রমে অল্প পরিমাণেই বৃদ্ধি হয়। যদি প্রতি মাসেই গর্ভের আকার বিস্তৃত হইত, তবে গর্ভিনীর গর্ভভার বহন ও গর্ভরক্ষা বড় বিষম হইয়া উঠিত। দয়াবান পরমেশ্বর গর্ভকে এই আশ্চর্য্য স্থিতিস্থাপকতা প্রকৃতি দিয়া সে সম্ভাবিত দুঃখের লাঘব করিয়াছেন। যে ছয়মাস কাল গর্ভ অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হয়, সেই সময়েই গর্ভজাত সত্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমেক্রমে প্রস্তুত ও সম্পন্ন হইতে প্রারম্ভ হয়। প্রথমে সত্বের মস্তক চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, পরে যত মাস যাইতে থাকে, ততই তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হয়। গর্ভস্থ সত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সুসম্পন্ন হইলে, জরায়ুর মধ্যে তাহা আপনা আপনিই সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। গর্ভস্থ সত্ব যদি এরূপ সঙ্কুচিত ও অল্পায়ত না হইয়া প্রসারিত ও বিস্তৃত হইত, তবে গর্ভিনীর গর্ভধারণেরও বিষম ব্যাঘাত ঘটিত সন্দেহ নাই! কিন্তু ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় কৌশল! গর্ভস্থ নিঃ-সহায় জীব, সকল বিষয়েই নিরাপদে গর্ভশয্যায় শয়িত ও ক্রমেক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই রূপে নয় মাস কালের মধ্যে গর্ভস্থ অচেতন সত্ব ক্রমেক্রমে সচেতন জীবরূপে পরিণত হয়।

এ কাল বড় বিষম কাল। এ সময় বড় সতর্কতার সময়। এ সময়ে দম্পতীদের কিঞ্চিৎ অসাবধানতা হইলে আর রক্ষা নাই। গর্ভস্থ নিরুপায় জীবের নিমিত্তে পরমেশ্বর যে সকল মঙ্গলময় নিয়ম প্রণালীনির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সুন্দর-রূপে প্রতিপালিত না হইলে, পাপের ফল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সে দুঃখ আমরণ কাল স্থায়ী।

পিতামাতার গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরাই ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন। এ সময়ে জনক জননীর মনোবৃত্তি স্বভাব যেরূপ থাকে, তাঁহাদের আত্মজ সন্তানেরও স্বভাব সেই রূপ হয়। ফলতঃ, পিতামাতার সদসৎ প্রকৃতি সন্তানে এক প্রকার প্রতিভাত হয় বলিলেই হয়! এই নিমিত্তেই আমাদের পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, "পুরুষের আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে!" বস্তুতঃ, এ কথা মিথ্যা নহে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কারণ গুণ কার্য্যে সংক্রামিত হয়। সন্তানের জন্মকালে তাঁহারা যে রূপ অবস্থায় থাকিবেন, তাঁহাদের আত্মজ সন্তানও অবিকল সেই রূপ ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সদসৎ গুণাগুণই সন্তানে অবভাষিত হইবে। তাঁহাদের সদসদ্ মনোবৃত্তি সন্তানে বলবতী থাকিবে।

অতএব, এরূপ বিষম সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতিসাধন ও সত্যপথে বিচরণ করিয়া কাল যাপন করা পুণ্যার্থী দম্পতীদের প্রধান ধর্ম্ম। যাহাতে গর্ভস্থ নিরুপায় শরণাগত সন্তান উচিতমত মনস্বী, তেজস্বী ও উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, সৌভাগ্য লোলুপ দম্পতীদের এরূপ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য; যাহাতে আত্মজ সন্তান ভগ্নশরীর, হীনবীর্য্য ও ভীরুস্বভাব না হইয়া উত্তম সুস্থশরীর, বিলক্ষণ বীর্য্যবান্ ও অসাধারণ সাহসিক হয়, প্রত্যবায় ভাগী দম্পতীদের এরূপ যত্ন করা অগ্রে কর্ত্তব্য। সকলে যদি সন্তানোৎপাদনের এই সকল মঙ্গলময় নিয়ম রক্ষার অনুগামী হয়, তাহা হইলে

পাপ তাপ দূরে যায়, দুঃখ ক্লেশ তিরোহিত হয়, সুখ পদার্থও ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া আইসে। আহা! তাহা হইলে, পাপময় পৃথিবী পুণ্যময় হয়, দুঃখপূর্ণ সমাজ সুখ পূর্ণ, এবং নিরানন্দ সংসার আনন্দে ভাসমান হয় সন্দেহ নাই।

জীর্ণ শব।

এক দিন নদীতটে করিতে ভ্রমণ,
করিলাম এক জীর্ণ শব বিলোকন।
নাহি কিছু মাংস চর্ম্ম অস্থিমাত্র সার,
খসিয়া পড়েছে যত দশন তাহার ;
নাহি উরু পদ আর অঙ্গুলি নখর,
দেখিতে সিহরে অঙ্গ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সুভীষণ সেই শব করিলে দর্শন,
সহসা বিবেক যেন কহিল তখন ;—
"হে সুরূপ অভিমানি যুবক সকল !
রূপ-মদে কভু আর হওনা চঞ্চল।
বদন রদন-হীন বিকৃত দর্শন,
এক বার এই শব করহ ঈক্ষণ।
কোথা সেই রম্য তনু চম্পক-বরণ,
নবীন নীরদনিভ কেশ সুচিক্কণ ?

"কোথা সে বিলোল নেত্র বিলাসঘূর্ণিত,
কোথায় তারকা ইন্দীবর বিনিন্দিত ?
কোথা মুক্তারাজিনিভ সুরম্য দশন,
কোথা সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ দর্শন।
কোথায় আরক্তাধর বিম্ববিনিন্দিত,
কোথা সে বদন ফুল্ল গোলাপ গঞ্জিত।
প্রফুল্ল কমলনিভ সুরম্য বিমল,
কোথায় কোমল করপল্লব যুগল ?
মৃণালনিন্দিত কোথা বাহু সুগঠিত,
কৃতান্ত দশনে সব হয়েছে চূর্ণিত ;
অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা,
কিছু দিন পরে হায় ! মাটি হবে তাহা।
অনিত্য সকল এই ওহে যুবজন"
তাই বলি রূপমদ দেহ বিসর্জ্জন।

জীর্ণ তরু।

একদা গোধূলি কালে ভ্রমণ কারণে,
চলিলাম ভাবময়ী কল্পনার সনে।
পথিপ্রান্তে দেখি এক জীর্ণ তরুবর,
সহসা সম্বোধি মম কহিল অন্তর।—
"ওহে বৃক্ষ একি দশা হয়েছে তোমার,
জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন শাখ বিকৃত আকার।
কোথা সে শ্যামল পত্র নয়নরঞ্জন,
এক দিন ছিল যারা তব বিভুষণ।

কোথা সেই সুদর্শন বিহঙ্গমগণ ;
যারা তব ডালে বসি করিত কূজন।
শ্রান্তি বিনাশিনী কোথা ছায়া সহচরী,
সেবিত যে শ্রান্ত জনে সুযতন করি।
ছিল তব দশা যবে নেত্র তৃপ্তিকর,
কত জনে কত মতে করিত আদর ;
পথশ্রান্ত জনগণ বিশ্রাম-আশায়,
আসিয়া বসিত তব শীতল ছায়ায়।
দোলাইয়া তব পত্র মন্দ সমীরণ,
তালবৃন্ত প্রায় সবে করিত ব্যজন।
ছিল তব সুগায়ক বিহঙ্গমকুল,
কি ছার সারঙ্গী তান নহে যার তুল।
সদা তারা ডালে বসি সুললিত গান
করিত রে, মানবের মোহিয়া পরাণ।
নাই নাই নাই হায়! এবে কিছু তার,
দেখিলে সন্তাপ হয় দুর্দ্দশা তোমার।
ধরাশায়ি পত্র তব সুপ্রিয় ভূষণ,
(হায়! এবে শুষ্ক) সবে করিছে দলন।
কুঠার আনিয়া এবে কাঠুরিয়াগণ,
আসি তব অঙ্গ হায়! করিবে ছেদন।
"শুনহে ভাবুক জন জানিও নিশ্চয়,
চির দিন এক দশা কাহারো না রয়।"

হিন্দুহষ্টেল। { হিঃ সাঃ শ্রীরঃ—

বিদ্যা।

বিদ্যা অতি রমণীয় পদার্থ ! নানা পুষ্পসুশোভিত পরম রমণীয় উদ্যান ও শারদপূর্ণিমার মনোমোহন চন্দ্রও কান্তিতে ইহার নিকট পরাজিত হয়!—প্রভাতকালের সুদৃশ্য সূর্য্য ও সহস্রসহস্র হীরক খণ্ডও ঔজ্জ্বল্যে ইহার নিকট পরাস্ত হয় !—এবং নিগূঢ়প্রভ অয়স্কান্তমণি ও বিলা-সিনীগণের বিভ্রমবিলাসও আকর্ষণী গুণে ইহার নিকট পরাভূত ও তিরস্কৃত হয়। বিদ্যা অক্ষয় রত্ন ! যথেচ্ছ বিতরণ করিলেও ইহার ক্ষয় হয় না ; প্রত্যুত বৃদ্ধিই হইতে থাকে।—বিদ্যা স্পর্শমণি স্বরূপ !—ইহার সংসর্গে অপদার্থ মানুষেরও পদার্থ জন্মে ও সে লোক সমাজে পূজ্য ও আদরের আস্পদ হয়।

বিদ্যাই মনুষ্যের সুখ ও সচ্ছন্দের একমাত্র উপায়। ইতর জন্তুদের বিদ্যা বা শাস্ত্রের কিছু আবশ্যকতা নাই। পরমেশ্বর তাহাদিগকে এক প্রকার সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। সদ-সদ্বিবেচনার নিমিত্তে তাহাদিগকে কখন চিন্তিত বা প্রতি-হত হইতে হয় না। অন্নের জন্যে তাহাদের ভাবনা নাই। অযত্নসুলভ বন্যবৃত্তিতেই তাহারা পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে। পরিধান বা পরিচ্ছদের জন্যে তাহাদিগকে বস্ত্রবয়ন করিতে হয় না। গাত্রে লোম বা পক্ষ দিয়া পরমেশ্বর তাহা-দের সে অভাব দূর করিয়াছেন। তাহারা স্বাভাবিক সংস্কার বলেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। কাহারও নিকট শিক্ষা বা পরামর্শ লইতে হয় না। সদ্যঃপ্রসূতা গাভী

বৎসের আর্দ্র শরীর লেহন করিয়া তাহাকে শুষ্ক করে। বৎসের কাছে কেহ আসিলে, শৃঙ্গচালনা করিয়া, তাহাকে মারিতে যায়। কাক কপোতাদি পক্ষি সকল ডিম পাড়িবার সময়ে তৃণকাষ্ঠ আহরণ করিয়া মনোমত স্থানে কুলায় নির্ম্মাণ করে। যথাসময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়া, তাহা প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্তে কতই যত্ন ও পরিশ্রম করে। তাপ দিবার জন্যে পক্ষি ও পক্ষিণী পালা করিয়া লয়। ডিম্বের মধ্যে সত্ত্ব জন্মিয়াছে কি না জানিবার নিমিত্তে সর্ব্বদাই ডিম্বের উপর কাণ পাতিয়া থাকে। একবিংশ বা দ্বাবিংশ দিবসে ডিম্বের মধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া চঞ্চুপুট দিয়া ফুটাইয়া ফেলে। খাইবার সময় কৌশলে নিজ কণ্ঠ মধ্যে তণ্ডুলকণা সঞ্চয় করিয়া রাখে। কুলায়ে গিয়া শাবকদের চঞ্চুতে আপনার চঞ্চু দিয়া সেই তণ্ডুলকণা খাওয়াইয়া দেয়। কোন কোন পক্ষি স্বস্ব শাবকদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া উড়াইতে পর্য্যন্ত শিখায়। বিড়ালনকুলাদি জন্তুর ব্যামোহ হইলে জঙ্গলে গিয়া এক প্রকার ওষধির পত্র চর্ব্বণ করে। এ সকল অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাদিগকে কাহাকেও শিখাইতে হয় না। আপন আপন স্বাভাবিক সংস্কার বশতই করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের সে রূপ হইবার নহে। পরমেশ্বর মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়া মনুষ্যকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শরীর রক্ষার নিমিত্তে মনুষ্যকে শারীরস্থান ওশারীরবিধান বিদ্যার অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হইবে। যত দিন ইহার বিশেষ উন্নতি না হইবে, তত দিন রোগ, শোক, জরা,

অকাল মৃত্যু প্রভৃতি পাপ সকল পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইবে না। পদার্থবিদ্যা মনুষ্যকে বুঝিতে হইবে, তবে তিনি আকস্মিক বিদ্যুদগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। বায়ুর গতি ও ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তিনি সাহস করিয়া, বাত্যা ও ঝটিকার আবাসস্বরূপ অকূল সমুদ্রে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবেন। বিদ্যাই এই সকল কঠিন বিষয় সম্পাদনের মূল। বিদ্যা বিনা এ সকল বিষয়ের সদসদ্বিবেচনা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুই হয় না। অতএব বিদ্যার নিমিত্তে একান্ত যত্ন ও সাধ্যবসায় পরিশ্রম করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিদ্যা ও শাস্ত্রের আলোচনায় অনির্ব্বচনীয় সুখ! বিদ্বানেরাই সে অনির্ব্বচনীয় সুখের একমাত্র অধিকারী। জন্মান্ধ যেমন শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মনোহর শোভা অনুভব করিতে পারে না; জন্মবধির যেমন তানলয়বিলাশিনী বিশুদ্ধস্বরসংযোগবতী গীত শুনিয়া মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে না; বিদ্যাবিহীন, তেমনি বিদ্যানুশীলনের অনির্ব্বচনীয় সুখের বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত যখন তাঁহার পর্য্যাবেক্ষণিকায় আরোহণ করিয়া গ্রহনক্ষত্রধূমকেতু প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখন তাঁহার মনে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ ও অতুল আনন্দের উদয় হয়। অন্য কেহ সে অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী নহে। গ্রহণ সময়ে রাহু আসিয়া চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে, এই স্ত্রীজল্পিত প্রাচীন কথা তিনি কি আর বিশ্বাস করেন?—তিনি গ্রহনক্ষত্রের স্বরূপ, কক্ষা, গতি ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে

নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করেন। ভুগোলবিদ্‌পণ্ডিত, যখন চিত্র সকল লইয়া ভূগোলশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তখন তাহার মনে কি অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হয়!—অন্য কেহ সে অখণ্ড সুখের অংশভাগী হইতে পারে না। তিনি কি আর সুমেরুকে স্বর্ণময় ও মানুষচক্ষুর অগোচর বলিয়া বিশ্বাস করেন? তিনি পর্ব্বতাদির স্বরূপ ও উৎপত্তির নিয়ম বুঝিতে পারিয়া, সে ভ্রমপ্রমাদ হইতে মুক্ত হন—তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। পদার্থবিদ্‌ পণ্ডিত, যখন পদার্থ সকলের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেন তখন তাঁহার মনে যে অনির্ব্বচনীয় নূতন নূতন আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম হইবার বিষয় নহে—তিনি কি আর সহস্রফণাধর বাসুকির শিরকম্পই ভূমিকম্পের কারণ, এই প্রমত্তজল্পিত বৃথা কথা বিশ্বাস করেন? তিনি পদার্থ সকলের কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়া সুখসাগরে সন্তরণ করেন—অন্য কাহারো সে অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হইবার শক্তি নাই।

বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য। দুর্লভ জ্ঞান পদার্থই মনুষ্যকে পশু হইতে প্রভেদ করিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না—ইতর জন্তুদের মত কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের বশীভূত হইয়া জীবিত কাল বৃথা নষ্ট করে। জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তাহাদের দুই চক্ষের বিষস্বরূপ। অমূলক গল্প কলহ ও পরনিন্দাই তাহাদের যার পর নাই শ্রুতিসুখকর। শুনিয়া আহ্লাদ রাখিবার আর স্থান পায় না। বিদ্যা না থাকিলে ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও উপচিকীর্ষা

হয় না। সুতরাং, বিদ্যাহীনদিগের মনে পাপ বুদ্ধি ও অপচিকীর্ষাই ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতে থাকে। অর্থের অপ্রতুল হইলে দুঃসাহসিকতা ও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে—নিরপরাধ ধার্ম্মিকদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পথে বসায়। কামানল প্রজ্বলিত হইলে, সাধ্বীদিগের সতীত্ব নষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হয় না।

বিদ্যাব্যতিরেকে জীবন বিফল। যে সকল বালক পিতার আজ্ঞাধীন থাকিয়া শৈশবে বিদ্যাভাস না করে, তাহাদিগের চির-জীবন কেবল কষ্টতেই যাপিত হয়, তাহারা প্রকৃত সুখের মুখাবলোকন করিতে কখনই পারে না; শান্তি কি পদার্থ তাহারা কখনই জানে না। তাহাদিগের কোন সমাজে কখন আহ্বান হয় না, কেহ আদর করিয়া তাহাদিগের সহিত আলাপ করে না, তাহারা লোকের অপকারী না হইলেও সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে। বিদ্যা না থাকিলে, লোকে প্রায় সকল প্রকার অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করে, কুবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া মনকে বিপথগামী করে, বুদ্ধিবৃত্তি একবারে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় নিস্প্রভো হইয়া পড়ে, কামাদি নিকৃষ্টবৃত্তি সকল আপন আপন প্রসবিতাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন ক্ষৌণীপাল হীন বীর্য্য হইলে দস্যুপ্রভৃতি দুর্বৃত্ত লোকে রাজ্য বিপ্লব করণে প্রোৎসাহিত হইয়া অকুতোভয়ে সর্ব্ব স্থানে অত্যাচার করে, সেই প্রকার বিদ্যা অভাবে বুদ্ধির ক্ষীণতা হইলে কামাদি দুর্দ্দান্ত রিপু সকল মনোরাজ্য অধিকার করিয়া একবারে পুরুষের সকল গুণ নষ্ট করে।

ধৃতি, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিনয়, শীলতা, দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি গুণ থাকিলে মানুষ প্রতিষ্ঠাভাজন হয়, এ সকল গুণ বিদ্যা হইতে সমুৎপন্ন হয় ; সুতরাং বিদ্যা না থাকিলে হৃতগৌরব ও হতাদর হইতে হয়, মূর্খ বলিয়া সকলে উপহাস করে ; অতি ইতর জনেও অপমান করে ; সুহৃদ বান্ধবাদিও ঘৃণা করে ; অধিক কি, পিতা মূর্খ হইলে পুত্রেরাও অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

পুত্র গুণবান্ হইলে জনক জননী যে প্রকার আনন্দার্ণবে ভাষেণ, মূর্খ হইলে তেমনি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। মূর্খ সন্তানের কারণ, মাতা পিতা যাবজ্জীবন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধীভূত হন। তাঁহারা স্বয়ং দোষী না হইলেও অবোধ মূর্খ তনয়ের দোষে লোক সমাজে তিরস্কৃত ও অবমানিত হন।

মূর্খ ব্যক্তি, যদি প্রভূত ধনশালী রূপবান ও মহা কুলীন হয়, তথাচ মূর্খতা দোষের জন্য কেহ তাহার সমাদর করে না, এবং তাহার সহবাস করিতে অনেকে পরাঙ্মুখ হয়। যদিও ধনলুব্ধস্তাবকেরা আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সাক্ষাতে কপটভাবে তাহার যশোকীর্ত্তন করে, কিন্তু পরোক্ষে তাহার নিন্দা করিতে ত্রুটি করে না। লোকে স্ব স্ব স্বার্থ উদ্দেশেই মূর্খ ধনীজনের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সিদ্ধপ্রয়োজন হইলে আর তাহার নিকটস্থ হয় না।

মূর্খ লোকের ধন প্রায় অসৎ কার্য্যেতেই পর্য্যবশিত হয়। অসাধু বঞ্চকদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পান পর-

দারাদি বিগর্হিত বিষয়ে বিপুল বিভব বিসর্জ্জন করে, এবং ধনগর্ব্বে বিমোহিত হইয়া লোকের উৎপীড়ক হইয়া দাঁড়ায়।

মন অতি চঞ্চল। বিষয় বিশেষে নিয়োজিত না হইলে স্থির থাকে না। এ নিমিত্তে মূর্খেরা প্রায় দোষে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মূর্খেরা পৃথিবীতে পাপ ও অনিষ্টের স্রোত প্রবাহিত করিতে থাকে। সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মলঙ্ঘনজন্য তাহারা পদে পদে বিপদ্গ্রস্থ হয়, এবং পরিশেষে সমাজের দুর্ব্বিসহ গলগ্রহ হইয়া উঠে। অতএব, জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্তে, আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত। জীবিতকালের মধ্যে মানুষকে যতগুলি কর্ত্তব্য করিতে হয়, এই কর্ত্তব্যটীই সেই সকল কর্ত্তব্যের প্রধান। বিদ্যার্থিদের ইহা সর্ব্বদা মনে জাগরিত রাখা উচিত।

ভাষা, বিদ্যার অধিরোহিণী স্বরূপ। ভাষায় উত্তম রূপ অধিকার না হইলে, সহজে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মতগ্রহ হইতে পারে না। আপনি বুঝিয়া অন্যকে উপদেশ দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। অনেকের বোধ আছে, ভাষায় অধিকার হইলেই, ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান জন্মে। তাহা ঠিক সত্য নহে। ভাষার কিছু জ্ঞানজননী শক্তি নাই, ভাষা কেবল জ্ঞানলাভের উপায় বা দ্বারস্বরূপ, এনিমিত্তে বাল্যকালে অগ্রে ভাষা শিক্ষা করা উচিত। ভাষা শিক্ষা করিলেই শাস্ত্রজ্ঞানের উত্তম সুযোগ হয়। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, অনুমিতি প্রভৃতি শাস্ত্রশিক্ষায় উত্তম উত্তম সাধন আছে বটে, কিন্তু, তথাপি, ভাষাও কিছু ইহার একটী গৌণ

সাধন নহে। অতএব বিদ্যার্থীদের অগ্রে ভাষা শিক্ষা করিয়া, ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভ করা উচিত।

পণ্ডিতেরা সমাজে আদৃত হন, চিরকাল সুখে ও সচ্ছন্দে দিনযাপন করেন। জীবিতকাল, তাঁহারা বন্ধুগণের প্রণয়াস্পদ, প্রতিবাসীদের পূজাস্পদ ও সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া, পৃথিবীর যথার্থ সুখ ভোগ করেন।

বিনয় শূন্য পুরুষের প্রতি।

শরীরের শোভা তব অতি মনোহর।
দীর্ঘবাহু স্থূলোন্নত চারু কলেবর॥
সমুদায় দেহে তব শোভা অতিশয়।
কিন্তু তুমি নিজে ত সুন্দর কভু নয়॥
দেহ তব গেহ মাত্র গৃহীত সে নয়।
গৃহের প্রসংশা কভু গৃহীর কি হয়॥
যে গৃহে করহ বাস তাহাই সুন্দর।
কে বলে তোমাকে, তুমি জনমনোহর॥
যে গৃহ সতত তুমি কর পরিষ্কার।
সুন্দর ভাবিয়া মনে কর অহঙ্কার॥
সে গৃহ ত্যজিতে তব হইবে যখন।
সুন্দরের অভিমান রবে কি তখন?
করিবে কি তুমি আর দেহ পরিষ্কার।
সংসারের লীলা যবে ফুরাবে তোমার?

তাই বলি সে গরবে দিয়া বিসর্জ্জন।
আপনি সুন্দর হতে করহ যতন॥
দোষ পরিশূন্য ভবে হয় যেই নর।
ইহ কালে পরকালে সে হয় সুন্দর॥
বিনয় বিহীন যেই জানিহ নিশ্চয়।
সুন্দর সে নয় কভু সুন্দর সে নয়॥
বিনয় রহিত জন দোষের আধার।
বিনয় আশ্রয় যুবা উচিত তোমার॥

স্বচিন্তা—স্বাবলম্বন।

পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানুষই যথার্থ সুখী। স্বচিন্তাই তাঁহার সকল কার্য্যের সাধনস্বরূপ; এবং স্বাবলম্বনই তাঁহার সকল সুখের মূলস্বরূপ। স্বচিন্তাই মানুষের দুরবস্থা সংশোধন ও উন্নতিসাধনের উৎকৃষ্ট উপায়, এবং স্বাবলম্বনই তাঁহার শরীরধারণ ও জীবনের সুখের প্রধান কারণ। স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন মনস্বী ও তেজস্বীদের আলোকসামান্য রত্ন। মানুষের এতাদৃশ মহা রত্নলাভে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনার কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তে সকল মানুষকেই বুদ্ধি প্রভৃতি গুটিকত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি দিয়াছেন। লোকযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী এই বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম্মে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। শৃগালকুক্কুর প্রভৃতি ইতর জন্তু সকলও আপনআপন

জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্তে যথাসম্ভব অল্প বুদ্ধি বা সংস্কার পাইয়াছে। তাহারা কোন বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া শিক্ষা করে না, কাহার নিকটে উপদেশও লয় না। তথাপি সেই সামান্য বুদ্ধিবলেই তাহাদিগকে কখন কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন বিষয়ে অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা সামান্য-বুদ্ধি ইতর জন্তুরও প্রশংসা করিতে হয়। বস্তুতঃ, স্বস্ব জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্তে কেহ কাহার মুখ চাহিয়া না থাকে, সকলেই স্বস্ব প্রধান হইয়া চলে, এই অভিপ্রায়েই পরমেশ্বর জীব সকলকে যথোপযুক্ত মানসিক বৃত্তি ও শারীরিক বল দিয়াছেন। সেই মনোবৃত্তি সকলের পরিচালনা ও শারীরিক পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে অভাবদুঃখ দূর, ও নির্ব্বিঘ্নে সুখসম্পত্তি লাভ হয়।

মানুষের যে কিছু প্রয়োজন হয়, তৎসমুদায় উপার্জ্জন করা পরিশ্রম সাপেক্ষ। যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই লাভ হয় না। অন্যের আনুগত্য ও মনস্তুষ্টি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা কাপুরুষের কর্ম্ম, কিন্তু ইহাতেও যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। অন্যে দিবে, তবে আমার হইবে, এরূপ বিবেচনা করিয়া চেষ্টা করাও সামান্য পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে। কিন্তু এরূপ বৃথা যত্ন ও নিরর্থক পরিশ্রম করা হস্তপদবিহীন পঙ্গু ও নির্ব্বুদ্ধি জড়েরই শোভা পায় বিলক্ষণ সবলশরীর বুদ্ধিমানের পক্ষে ইহা যারপর নাই নিন্দার বিষয়। অতএব কাপুরুষতা সংগ্রহে এরূপ প্রগাঢ়

যত্ন ও পরিশ্রম না করিয়া, অযত্নসুলভ স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন বিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করাই সকলের উচিত।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের সুখ অতি অনির্ব্বচনীয়; মুখে বলিবার নহে। যিনি একবার পরের পরামর্শ অনুগামী ও পরাধীন হইয়া তাহার সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের কি অনির্ব্বচনীয় সুখ। এই দুইটী ধর্ম্ম যাহার আছে, তাহার বিপদ্‌কে বিপদ্‌ বলিয়া জ্ঞান হয় না, মহাদুঃখেও তিনি মুহ্যমান হন না। স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন তাহাকে অবলীলাক্রমে সকল দুঃখ ও বিপদের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনই মানুষের সকল সুখসৌভাগ্যের প্রসূতিস্বরূপ। স্বচিন্তা, স্বাবলম্বন ও পরিশ্রম ব্যতীত মানুষের দুরবস্থা দূর ও সুখসম্পত্তি লাভের এমন স্থির উপায় আর কিছুই নাই। ইচ্ছা করিয়া অন্যের বশীভূত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, মনস্বীর কর্ম্ম নহে। মানুষ সমান ধর্ম্মশীল মানুষের অধীন হইবে, ইহা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। অন্যের মত হস্ত পদাদি থাকিতে, অন্যের মত বুদ্ধিবৃত্তি থাকিতে, অন্যের অধীন বা অনুগত হওয়া কি লজ্জার বিষয় নয়? বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত ও মার্জ্জিত কর—স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনকে আশ্রয় কর—অনায়াসে সুখ-সম্পত্তি লাভ করিবে। যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হও, সে বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইবে; যদি দারিদ্র্য দুঃখে কাতর হও, ধনাগম হইবে; এবং যদি বিদ্যারত্ন লাভে যত্ন থাকে, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন এই দুই ধর্ম্মের সহায়তায় তাহাও লাভ হইবে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজা ভীমসিংহের উৎসাহবাক্য।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পারিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায়!
একথা যখন হয় মানসে উদয়—
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয়;
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয়;
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ,
সাজ সাজ সাজ, বলে, সাজ সাজ সাজ।
চল চল চল সবে সমর সমাজ,
রাখহ পৈত্রিক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার,
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার;
স্বার্থক জীবন আর বাহু-বল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার।
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান;
এস তায় সুখে সবে হইব শয়ান;
স্মরহ ইক্ষ্বাকুবংশ কত বীরগণ,
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন;

স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ।
বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়নন্দন!
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই,
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই,
স্বর্গ-সুখে সুখী হব, এস সব ভাই।

প, উ,।

স্বদেশানুরাগ।

স্বদেশানুরাগ সমাজের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। কি অধীতশাস্ত্র মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ, কি বর্ণজ্ঞান রহিত নির্ব্বুদ্ধি পরিশ্রমোপজীবিগণ, সকলেরই মনে এই স্বদেশানুরাগ জাজ্বল্যমান আছে। কি ভদ্র, কি অভদ্র, স্বদেশের বা স্বজাতীর নিন্দা শুনিলে আগুণ হইয়া উঠেন, প্রসংশা শুনিলে অতিশয় প্রীত হন।

স্বদেশের অনুরাগ অন্যান্য বিষয়ের অনুরাগের মত দর্শন-সাধ্য বা শ্রবণসাধ্য নহে। যে বিষয় দেখিবামাত্র মনের তৃষ্ণা নিবৃত্তি ও চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে, তাহাতেই সকল মানুষের অনুরাগ হয়; কিন্তু স্বদেশের সেরূপ নহে। অপরাপর বিষয় যাহাতে লোকের অনুরাগ জন্মে, তাহার অবশ্য কোন প্রীতিকর ধর্ম্ম থাকে। স্বদেশানুরাগের পক্ষে সে নিয়ম দেখা যায় না। স্বদেশ অসভ্যতায় পরিপূর্ণই হউক, আর জঘন্য আচার ব্যবহারে ম্লান হইয়া থাকুক, তথাপি জন্মভূমি

বলিয়া তাহার প্রতি দেশীয়দের একটী অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ থাকে। এই স্বদেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই সকল জাতিরা শত্রু হইতে দেশ রক্ষার জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নিজ পরিবারের কার্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠতর ভাবিয়া স্বদেশের রক্ষায় একান্ত যত্নশীল হয়। ফলতঃ, স্বদেশ ও স্বজাতি আপনার আবাস ও পরিবারে অনুরূপ মাত্র।

নিজ আবাসে যেমন আমরা অল্প পরিবার লইয়া থাকি, স্বদেশ গৃহে তেমনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃভগিনী বহুপরিবার লইয়া বাস করিতেছি, মনে করা উচিত। পরিবারের মঙ্গলকার্য্যসাধন যেমন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, স্বদেশের মঙ্গলকার্য্যসাধনও আমাদের সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। প্রতিদিন সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তে আমাদিগকে যেমন ক্ষণকাল ভাবনা চিন্তা করিতে হয়, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তেও আমাদিগের ভাবনা চিন্তা করা অগ্রে কর্ত্তব্য। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

স্বদেশানুরাগ যথার্থ ও ন্যায়ানুগত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আপামর সাধারণের যে স্বদেশানুরাগ আছে, সেটী স্বভাবসিদ্ধ, যাহা কিছু আপনার তাহারই প্রতি মমতাবশতঃ মানুষের অনুরাগ জন্মে; কিন্তু তাদৃশ অনুরাগের বশম্বদ হইয়া চলিলে দেশের উন্নতি না হইয়া, বরং ক্রমে ক্রমে অবনতি হইবারই সম্ভাবনা। স্বদেশের কুরীতি কুপ্রথা দেখিয়াও তাহার মিথ্যা প্রশংসা ও গৌরব করিয়া বেড়ান, ও সেই সমস্ত রীতি ও প্রথার সংস্কারের চেষ্টা না করা

কাপুরুষের কর্ম্ম। সকল জাতিরই কোন না কোন দোষ আছে। কোন সমাজই একবারে বিশুদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সকল দোষ সংশোধন করা দেশীয়-দের কর্ত্তব্য। স্বদেশের অভাবঅপ্রতুল মোচন ও কুপ্রথা প্রভৃতির সংস্কারসাধনই প্রকৃত স্বদেশানুরাগের কর্ম্ম। কতকগুলি লোক স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অন্ধ অনুরাগের বশম্বদ হইয়া, দেশের আচারগত দোষ বা আপনাদের কুসংস্কারজনিত দোষ, কিছুই বুঝিতে পারেন না। ওদিকে বিদেশের লোকদিগকে দুইচক্ষে দেখিতে পারেন না। বিদেশীদের উন্নতিকে উন্নতি বলিয়াই বোধ করেন না। বিদেশীদের নাম করিলেই অমনি একবারে জ্বলিয়া যান। এরূপ স্বদেশানুরাগকে যথার্থ স্বদেশানুরাগ বলে না। অতএব, এরূপ অনুচিত স্বদেশানুরাগের বশীভূত হইয়া, স্বদেশের সর্ব্বনাশ করা দেশীয়দের কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে স্বদেশের হিতসাধন ও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশের মঙ্গলসাধন করা উচিত বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া, অন্যদেশের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করা উচিত নহে। ইহা অত্যন্ত স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্ম। স্বদেশের সুখসচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া, আর এক দেশকে চিরকাল অধীনতা দুঃখে দুঃখিত করা নিতান্ত স্বার্থপর অসভ্যের কর্ম্ম। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখের চেষ্টা করা, যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অসভ্যের কর্ম্ম, অন্যদেশের অনিষ্ট করিয়া, স্বদেশের উন্নতি করা, তদপেক্ষা

শতগুণে অসভ্যের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পৃথিবীর সকল দেশকেই মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়াছেন। পরিশ্রম করিলে, সকল দেশেই প্রাণধারণের নিমিত্তে পর্য্যাপ্ত আহার পাওয়া যায়। তাঁহার অনুগ্রহে সকল দেশে বসিয়াই শাস্ত্রের আলোচনা হয়। সকল দেশেই আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। অতএব, অনুচিত স্বদেশানুরাগের বশীভূত হইয়া, অমঙ্গলের কারণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করা, ও যুদ্ধ করিয়া অন্য দেশকে বশীভূত করা, কোন জাতিরই উচিত নহে। এরূপ করিলে, পরমেশ্বরের নিকট তাহার নিয়ম লঙ্ঘন জন্য অপরাধী হইতে হয়।

স্বদেশের প্রতি স্নেহমমতা অতি অনির্ব্বচনীয়! স্বদেশের মত মনের আহ্লাদকর ও চক্ষুর প্রিয়দর্শন পদার্থ এমন আর কিছুই নাই। স্বদেশ যে কি রমণীয় পদার্থ, তাহা চিরপ্রবাসী ব্যক্তি বই আর কেহই বুঝিতে পারেন না। যখন তাঁহার হৃদয়মুকুরে স্বদেশের স্নেহময়ী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। আহা! যেস্থলে বাল্যকালে মনের সাধে বাল্যখেলায় নিযুক্ত ছিলাম, যে স্থানে পরমসুখে যৌবনকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থান স্নেহপূর্ণ পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নি পুত্রকলত্র বন্ধুবান্ধবগণের আবাস স্থান, তাহার নাম করিলে অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠে; তাহা অপেক্ষা প্রিয়তম পরম রমণীয় পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে? এমন সুখময় স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া, যাঁহার মন চঞ্চল না হয়, তাঁহার গাম্ভীর্য্যগুণে কি প্রয়োজন? স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া যিনি নিশ্চিন্ত

থাকেন, স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া যাহার চিত্ত বিচলিত হয় না, তিনি কখনই মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন।

বাজবাহাদুরের হিন্দুরাণী।

অস্ত যায় দিনমণি, পশ্চিম গগণে ঐ লোহিত বরণ।
কষিত কাঞ্চন বিভা, মেঘের অঞ্চলে কিবা,
বিজলীর রেখা প্রায়, শোভিত রঞ্জন।
কাল কামিনীর অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ॥
ত্যজিল কিরীট কান্তি, কাননের শৃঙ্গ, আর পর্ব্বত শিখর।
তরুরে ত্যজিল মায়া, পাছে তার নাহি ছায়া,
ত্যজি পক্ষী গগণের কুলায়ে তৎপর।
ত্যজিয়াছে বাজ রাজ মালব সুন্দর॥
ত্যজিয়াছে বাজ রাজ মালব সুন্দরীরে, অনাথিনী প্রায়।
বিজাতী শত্রুর তরে, একাকিনী পশে ঘরে,
ধীরে ধীরে আজ ধনী শয়িত শয্যায়।
বসন অঞ্চলে ঢাকি বদন বিভায়॥
আসিছে আদম জয়ী, লভিতে সুন্দরীরে, মালবের সার।
উল্লাসে প্রমত্ত মন, লভিতে শ্রমের ধন,
এত যে করেছে রণ, আজি পুরষ্কার।
লভিবে বিজয়ী আজ রাজীব আশার॥
সদর্পে পশিছে জয়ী রাণীর আগারে, আহা সুখ নিকেতনে!
সৌরভে পূরিল ঘ্রাণ, সার্থক নয়ন প্রাণ,
মহার্ঘ বসনে ঢাকা সুন্দরী বদন।
রূপেতে করিল জয় বিজয়ীর মন॥

একাকিনী শুয়ে বামা, শোভিত শয্যায়, আহা মুরতি মোহন!
নীরব সে নিকেতন, বহে সুধু সমীরণ,
দুখ শ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে, করিতে রোদন—
কোথা বাহাদুর বাজ আজ হে এখন?॥
উল্লাসে আইল জয়ী, হরিতে কুসুমরে, মালব উদ্যানে।
মোহিত বীরের মতি, আইল সে দ্রুতগতি,
দেখে ধনী নিদ্রাবতী, মলিন বয়ানে।
নাহি শ্বাস, নাহি হাস, নাহিক সজ্ঞানে॥
চমকিল বীরহিয়া, দেখিয়া সুন্দরীরে, স্থির অচঞ্চল।
"উঠ উঠ প্রাণ ধন, এই দেখ কে এখন,"—
কহিল জয়ী তখন, ফেলিল অঞ্চল।
নাহি বাক্, নাহি সরে বদন কমল॥
ধর হে মালব জয়ী, সুন্দরীর কর, তোল হাতেতে ধরিয়া।
দেখ তার মুখ ধরি, কাঁদিছে কি সে সুন্দরী,
দুখিনী কি বাজরাণী, রাজত্ব লাগিয়া।
ধরমের দুর্গ তার কে লয় জিনিয়া?
ধরিল সুন্দরী-কর, ফেলিল সে কর ফিরে, ত্যজিয়া নিশ্বাস।
দেখ ওহে দুরাচার, নিধন কেমন তার,
বাড়ায়েছে রূপ, তোমা করিয়া নিরাশ।
ছুঁয়োনা সতীরে যাও আপন আবাস॥
হলাহল পানে ধনী, ত্যজিয়াছে প্রাণরে, তোমার জ্বালায়।
ওই দেখ বিষাধার, পাশেতে রোয়েছে তার,
শিখাইতে দুরাচার, ধরম তোমায়।
কেমন প্রশান্ত মনে শেবিয়াছে তায়!

ফিরে যাও হে বিজয়ী, নারী-পরাজিত তুমি হয়েছ নিশ্চয়।
বোলো লোকে প্রকাশিয়া, এ নারীর বীর হিয়া,
তব বীর তরবার হতেও দুর্জ্জয়।
সতীর সতীত্ব কভু, ভাঙ্গিবার নয়॥
এ নারীর ধর্ম্ম যশ, ঘোষিবে কবীর গীত, চিরদিন ভবে।
যুগান্তর গত হবে, তোমারে ভুলিবে সবে,
যশের মন্দিরে সতী সজীবন রবে।
বীরাঙ্গনা সতী বলে দেশে তারে কবে॥

বামাবোধিনীপত্রিকা।

সামাজিকতা।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, প্রাণিগণের আবাসস্বরূপ, এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতে নানা জাতীয় জীব-জন্তু আছে। সকল জীবজন্তুর স্বভাব বা অবস্থা সমান নহে। কতকগুলি জীব অতি বিস্তীর্ণ বনেই থাকিতে ভাল বাসে; অভ্রভেদী জীর্ণবৃক্ষে আবৃত লতাগুল্মে আচ্ছন্ন নিবিড় বনই তাহাদের পরম সুখের আলয়। কতকগুলি জীব অতলস্পর্শ গভীরজলে থাকিতে ভালবাসে; দূরবিস্তৃত গভীর সমুদ্র বা দূরবাহিনী নদনদীই তাহাদের প্রধান আরামস্থল; এবং কতকগুলি জীব ইচ্ছামত কখন জলে, কখন বা স্থলে, উভয় স্থানেই থাকিতে ভালবাসে; জলচর-সঙ্কুল জল ও স্থলচর পরিপূরিত স্থল, উভয়েই তাহাদের সমানরুচি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পৃথিবীতে জলচর, স্থলচর

ও উভচর এই ত্রিবিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তিন প্রকার জীব তাঁহার বিশ্বরাজ্যের প্রজাস্বরূপ।

মনুষ্য সকল জীবের প্রধান। মনুষ্যকে সকল জীবের রাজা বলিলেও বলা যায়। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে, অতি দুরন্ত বনহস্তিকেও পিঞ্জরবদ্ধ করিতে পারেন, ও সহস্র সহস্র সহচরের মধ্যস্থিত অতি ভয়ানক দুর্দ্ধর্ষ বনব্যাঘ্রকেও আক্রমণ করিতে ভীত হন না। মনুষ্যকে কেবল স্থলচর না বলিয়া, সর্ব্বচর বলিলে বলা যায়। মনুষ্য বিমানেও আরোহণ করিতে পারেন, এবং অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া, অবলীলাক্রমে সন্তরণপটু বড় বড় জলচরকেও পরাজিত করিয়া দুস্তর সাগর সকল উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মনুষ্য ও ইতরজন্তুর স্বভাব অনেক বিভিন্ন বটে; কিন্তু কতকগুলি বৃত্তি প্রায় সকল জীবেরি সমান। এই নিমিত্তে কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল জীবজন্তুকেই সমান দেখিতে পাওয়া যায়।

আসঙ্গলিপ্সা সকল জীবজন্তুরই সমান। সকল জীবজন্তুই স্বজাতীয়কে লইয়া একত্রে থাকিতে ভাল বাসে। হস্তিরা মিলিয়া একটী পরাক্রমশালী হস্তিকে আপনাদের দলপতি করে। তাহারা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নির্ভাবনায় পরম সুখে একত্রে সহবাসসুখ অনুভব করিতে থাকে। আহার বা বনবিহারের ইচ্ছা হইলে, তাহারা সকলে একত্র না হইয়া কোথাও যায় না। বিপদ উপস্থিত হইলে, একত্র হইয়া, সকলেই স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করে। প্রসিদ্ধ পর্য্যটকেরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চক্ষে দেখিতে পাইলে, কেহ শুনিতে চায় না, এ নিমিত্তে আমরা ইতর জন্তুগণের আসঙ্গলিপ্সার

একটী গ্রাম্য উদাহরণ দিতেছি। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে মৎস্যসকল জলাশয়ে ভাসমান হয়। ভাসিবার সময় সকল মৎস্যই একবারে ভাসিয়া উঠে, সন্তরণ দিবার সময় সকলেই একবারে সন্তরণ দেয়; আবার, জলমগ্ন হইবার সময় সকলেই একবারে জলমগ্ন হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বোধ হয়, একত্রবাসবিষয়ে সকল জীবজন্তুরই স্বভাব একপ্রকার।

আসঙ্গলিপ্সা অপর জীব অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক বলবতী। এ নিমিত্তে মনুষ্য কখন একাকী থাকিতে ভাল বাসেন না। নির্জ্জন বাসের দুঃখ ও একত্র বাসের সুখ বর্ণন করিবার এ স্থান নহে। ফলতঃ, বন্দি, চিরপ্রবাসী প্রভৃতি-গণের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ইহা সহজে অনুভব করিতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, মনুষ্যের মনে এই বৃত্তি দিয়া পৃথিবীকে কি সুখের ও সচ্ছন্দের স্থান করিয়াছেন, বলা যায় না। ইহা না থাকিলে, গৃহস্থজনসুশোভিত পল্লী, গ্রামীণজনপরিপূরিত গ্রাম, ও বহুজনাকীর্ণ শোভনতম প্রসাদরাজিরঞ্জিত নগর কখন দৃষ্ট হইত না। রাজধানী নগর উপশল্য প্রভৃতির কার্য্য কিছুই হইত না। পরমে-শ্বরের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্র-সকলেরও আবিষ্কার হইত না। এই আসঙ্গলিপ্সাই মনু-ষ্যের সুখের ও আনন্দের মূলীভূত।

স্বতন্ত্রতা সকল দুঃখের মূল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখন সুখ ও সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন না। পরমেশ্বর আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন, কাহারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কহিয়

থাকিতে পারি না। মূকের মত নিঃশব্দ বসিয়া থাকিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। মনের তৃপ্তি বা তুষ্টিও জন্মে না। মনুষ্যসমাজই আমাদের এ বাসনাসিদ্ধির প্রধান উপায়। মনুষ্যসমাজে বাস ব্যতীত কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হইবার আর অন্য উপায় নাই। যখন কোন গৃহস্থের জীবনসর্ব্বস্ব একমাত্র পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়, আর তাহার শোকে পিতামাতা ভ্রাতাভগিনি প্রভৃতি ব্যাকুল হইয়া, পাগলের মত শুষ্ককণ্ঠে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রতিবাসী বই সান্ত্বনা আর কে করিতে পারে? তখন সেই প্রতি-বাসীদের অকপট স্নেহ ও যত্নই তাহার জীবন রক্ষার কারণ হইয়া উঠে। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখন আপনার বিপদ্-সময়ে এরূপ সমাজসুখ অনুভব করিতে পারেন না। সামা-জিকেরাই এই সকল অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী। পর-মেশ্বর কাহাকেও সম্পন্ন বা সর্ব্বক্ষম করিয়া দেন নাই। একটী মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, একটী মনুষ্য কিছু একাকী তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে পারেন না। বহু পরিশ্রমেও ইহা সাধ্য হইবার বিষয় নহে। এ নিমিত্তে একত্রে থাকিয়া, কতকগুলি সামাজিককে ক্ষেত্রে হলচালনা পূর্ব্বক কৃষি করিতে হয়, কতকগুলিকে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রসীবন করিতে হয়, কতকগুলিকে শাস্ত্রের উন্নতি ও গ্রন্থাদি রচনা করিতে হয়। এরূপ না করিলে, সকলের সকল বিষয় সুখে সম্পন্ন হয় না। এই প্রাকৃতিক নিয়মানু-সারে, আবহমান কাল অবধি, মনুষ্যসমাজ নিয়মিত, সংস্কৃত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে।

মনুষ্যসমাজ বড় সাধারণ সমাজ নহে। কোন একটী কল্যাণকর অনুষ্ঠানের নিমিত্তে একটী ক্ষুদ্র সমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করিতে হইলে, তাহার সুশৃঙ্খলার নিমিত্তে কতকগুলি নিয়ম বা শাসন প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা না করিলে, সে সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, এবং অভীষ্টসিদ্ধি না হইয়া, বরং ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট হইয়া উঠে। একটী সামান্য সমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করিবার নিমিত্তে যখন এরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইল, তখন বহুদূরবিস্তৃত মনুষ্যসমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করা মনুষ্যের সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এই সমাজসংস্থাপনের নিমিত্তে মনুষ্যকে তাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। মনুষ্যের স্বাভাবিক যত্নেই ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সামাজিকেরা একত্র হইয়া, সদসদ্বিবেচনা করিয়া, যাহা নির্দ্ধারিত করেন, তাহাই এ সমাজের নিয়ম হইয়া, সকলের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

জাতিভেদে সমাজভেদ হইয়া থাকে। এক্ষণে, পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবান্তর সমাজ প্রচলিত আছে। কারণ বশতঃ সকল সমাজের অবস্থা সমান নহে। দেশীয়দের অজ্ঞানতা ও পরাধীনতা প্রযুক্ত হউক, আর দুরন্ত রাজার অবিচার বশতঃই হউক, সমাজের উন্নতি সর্ব্বদাই রথচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে।

মিথিলাধিপতির আক্ষেপবচনে লক্ষ্মণ শৈবচাপ ভাঙ্গিতে উদ্যত।

হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত রামায়ণ আদিকাণ্ড ২য় ভাগ।

লজ্জা যদি বরিল এরূপ শূরগণে!
কহিল জনক পুনঃ আপেক্ষ বচনে,
আহা! আহা! আহা! অতি ক্ষোভের বিষয়!
সমাগত এত শূর—শূরসুতচয়!
এত এত ধনুর্দ্ধর—মহা ধনুর্দ্ধর,
বীরদর্পী—বীরগর্বী ভীম কলেবর;
ইহাদের মধ্যে কি এমন একজন,
নাই, যিনি পারেন পূরাতে মম পণ।
কি আশ্চর্য্য! মরি আমি এই মনস্তাপে,
অনেক নারিল গুণ দিতে শৈবচাপে।
ভাল ভাল যদি না পারিল কোন জন,
আকর্ষি ধনুতে গুণ করিতে যোজন।
টঙ্কারিতে সামর্থ্য কি হইল না কার,
দূরে থাক টঙ্কার—নোয়ান হল ভার।
থাকুক নোয়ান—নয় দূরে থাক সেহ,
স্থানান্তরে রাখিতে কি শক্ত নন কেহ।
কোথা পাই আক্ষেপের নিক্ষেপের স্থল,
হায় হায় নির্ব্বীর কি হল উর্ব্বীতল!
এইরূপে আক্ষেপিলে মিথিলাধীশ্বর,
লাগিলেন কহিতে লক্ষ্মণ বীরবর।

ওহে মিথিলাধিপতে, হেন বাক্য কোনমতে,
তদীয় বদনে নাহি হয় শোভাকর,
হয়নি নির্ম্মূল আজো ক্ষত্রিয় নিকর।
বীর প্রসবিনী এই বিপুলা ধরণী।
ভীরুগণে স্বুদু গর্ভে করে না ধারণ।
শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রতিভায়, কত বীর এ ধরায়,
সুবিখ্যাত—পারে কেবা করিতে গণন,
হয় নয় চিন্তি চিতে দেখুন নৃমণি।
বীরত্বাভিমানি যত ক্ষত্রিয়ের দল,
পরীক্ষা না করি নিজ নিজ ভুজ বল।
বৃথা গর্ব্বে হয়ে স্ফীত, সভাস্থলে উপনীত,
গেলেন তুলিতে চাপ হইয়া চঞ্চল।
লোভে হইলেন সবে উপহাসস্থল।
বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণে হেরি উপনীত
ভাবিলাম মোরা এঁরা গুণেও তেমন,
কে জানে যে ইহাঁদের, সাহসের বীরত্বের,
বাহিরে লক্ষণ মাত্র আছে বিলক্ষণ।
ভিতরে সদ্ভাব তার নাহিক কিঞ্চিৎ।
জ্যেষ্ঠ শ্রীরামের বল বাহুল্যে বর্ণিতে,
আমি যে তাঁহার দাস—যদি ইচ্ছা করি,
মেরু আদি নগগণে, উৎপাটিয়া এইক্ষণে,
নিক্ষিপিতে পারি সিন্ধু-সলিল উপরি।
পিনাকীর জীর্ণ ধনুঃ কি কষ্ট ভাঙ্গিতে।

দয়া।

দয়া অতি প্রধান ধর্ম্ম। দয়াবিহীন ব্যক্তি অপদার্থ পশুতুল্য। দয়া ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ। ইহাই নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের মূল, এবং লাভের প্রধান উপায়। দয়া দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, মূক ও বধিরদের জীবনের অবলম্বন স্বরূপ। ইহা অতি রমণীয় পদার্থ-অলোকসম্ভূত রত্নস্বরূপ। এই অলোকসামান্য রত্নজ্যোতিঃ যাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান্ আছে, তিনিই সাধু—তিনিই পৃথিবীর সমস্ত সুখের একমাত্র অধিকারী। যাহার শরীরে দয়া নাই, তাহার শরীর ধারণই বৃথা।

দুঃখী লোকদের দুঃখ দূর করিয়া যথাসাধ্য উপকার করা, বিপন্ন ব্যক্তিকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করা, অনাথদিগকে আশ্রয় দেওয়া, সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। উপকৃত ব্যক্তিকে দেখিলে চক্ষু পরিতৃপ্ত, মন আহ্লাদে প্রফুল্লিত হয়। উপকার করিবার ক্ষমতা থাকিতে এই সকল অনুপম সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকা ঘোরতর বিড়ম্বনা। যিনি এই পরোপকার সুখে সুখী হইয়াছেন, তাহার শরীরধারণ সার্থক। সংসার বিপদ্ আপদে পরিপূর্ণ। মানুষের যে কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বলা যায় না। আপদ্ বিপদ্ ও সুখসম্পদ অনবরতই রথচক্রের ন্যায় যাইতেছে আসিতেছে। অত্যন্ত সাবধান সতর্ক হইয়া চলিলেও সময়ে সময়ে বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। অতএব অন্যের দুঃসময়ে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা সকলেরই উচিত। সংসারের সকল মানুষের অবস্থা সমান নহে।

কারণ বশতঃ কেহ প্রভুত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; আর কেহবা ভয়ঙ্কর দারিদ্রদুঃখে জর্জ্জরিত ও হতবুদ্ধি হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। কারণবশতঃ কেহ সুবুদ্ধি বলিয়া সমাজে প্রশংসিত হইতেছে; আর কেহবা অবোধ বলিয়া জনসমাজে উপহসিত হইতেছে। কারণবশতঃ কেহ সবল, কেহ নির্ব্বল; আর কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ হইয়া কালযাপন করিতেছে। একাধারে সকল গুণ থাকে না, এবং দুই ব্যক্তি সমান গুণসম্পন্ন প্রায় দৃষ্ট হয় না, সুতরাং, সংসারে স্বস্ব প্রধান হইয়া চলা সকল লোকের সাধ্য নহে। অতএব পরস্পরের অসময়ে সাহায্য করিতে যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ধনীর উচিত নির্ধন দীনদরিদ্রদিগকে ধন দিয়া প্রতিপালন করেন। সুবোধের অবোধকে পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক। বলবানের দুর্ব্বলকে অভয় দেওয়া উচিত। পণ্ডিতের মূর্খকে উপদেশ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ সকল দয়ার কর্ম্ম।

দয়া প্রকাশ করিতে কেহই অক্ষম নহেন। পরমেশ্বর সকলকেই উপচিকীর্ষা বৃত্তিটী দিয়াছেন। পরের উপকার করিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। দয়ালু হইলে কেবল দান করিতে হয় এরূপ নহে। যাঁহার ধনবল নাই, তিনি ঋণ দিয়া পরের উপকার করিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। আপনার যে শক্তি আছে সাধ্যানুসারে তদ্দ্বারা উপকার করিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার শারীরিক বল থাকে, বল দিয়াই উপকার করুন; বিদ্যা থাকে

বিদ্যাই বিতরণ করুন; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ইচ্ছা থাকে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ দিন। যে কোন প্রকারে হউক পরের সাহায্য ও সমাজের উপকার হইলেই হইল। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করা, দেশীয়দের সুখসৌভাগ্যের উন্নতি চেষ্টা করা, এবং সৎপরামর্শ দিয়া লোককে সুখী করা, এ সকল দয়ার কর্ম্ম। মানুষের সহিত সদালাপ ও সৎকথন, বন্ধুগণের সহিত সপ্রণয় সম্ভাষণ, বয়স্যগণের সহিত অকপট ব্যবহার এবং গুরুজনের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি, এ সকলই দয়ার কার্য্য। পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক স্নেহ, সন্তানগণের প্রতি সস্নেহ বাৎসল্য, এবং সর্ব্বদা তাহাদের হিতচিন্তা, ইহাও দয়ার কর্ম্ম। সকলের প্রতি দয়া উচিত বটে, কিন্তু দয়ার পাত্রাপাত্র বিবেচনা করাও অতি কর্ত্তব্য। বিবেচনা না করিয়া দান করিলে সে দান কোন কার্য্যের হয় না। যদি কোন ব্যক্তি অতি পাপশীল হয়, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দুষ্কর্ম্মে অসৎকর্ম্মে অপব্যয় করে; সে কখনই দয়ার পাত্র নহে। এরূপ অসৎপাত্রকে দয়া করা, আর ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া দুইই সমান। তাহাদের কাকুতি মিনতি দেখিয়া আপাততঃ দয়া হয় বটে, কিন্তু সে দয়া ধর্ম্মবুদ্ধির অনুমোদিত নহে। দয়ালু ব্যক্তির তাহাকে সদুপদেশ দিয়া দয়া প্রকাশ করা উচিত। যাহাতে সে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ অবলম্বন করে, দয়াগুণে সেই সকল বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

দয়াধর্ম্মে কালযাপন করা মহানুভব ও মহাত্মার কর্ম্ম। যিনি চিরকাল অহর্নিশি যারপর নাই ব্যস্ত থাকিয়াও

এক মুহূর্ত্ত পরের উপকার করিতে ভুলেন না—যিনি পরের অনুপকারের বাসনা একবার মনেও করেন না, পরোপকারই যাঁহার প্রধান ব্রত, পরোপকারই যাঁহার সন্তোষের মূল, তিনিই মহানুভাব—তিনিই মহাত্মা এবং তিনিই যথার্থ পুণ্যবান। তাহার জীবন সার্থক।

মেনকা স্বপ্নযোগে উমাকে দর্শন।

বিগত যামিনী কালে, মহীধর-মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী।
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি॥
নিরখিয়া শুকতারা, চক্ষে বহে শতধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা।
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা॥
দারুণ দুঃখের ভোগে, বিষম বিভ্রম যোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণ কায়,
হিমহয় হিম কলেবর॥
আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিনতব,
অদ্রিদেহ আর্দ্র নহে স্নেহে।
এতদিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুঃখনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে॥

মৈনাক-সন্তান-শোকে, শূন্য দেখি তিনলোকে,
আলোকে আঁধার গিরিপুরী।
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর সলিলে তার,
মগ্ন হলো মোহনমাধুরী॥
সবে এক সুকুমারী, তাহারে ভিখারি নারী,
করিলে হে নিদয় পাষাণ।
হাহা কন্যা গুণবতী, সরল প্রকৃতি সতী,
দুঃখানলে দহে তার প্রাণ॥
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারির কোলে ভিখারিণী।
দীনাহীনা ক্ষীণাকারে, ভিক্ষাকরে দ্বারে দ্বারে,
ভূত প্রেত পেতিনী সঙ্গিনী॥
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন।
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন॥
অন্নাভাবে তনুশীর্ণ, গোধুলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাঁচর কুন্তল।
স্বর্ণশোভা হত বর্ণে, বনফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ-কুণ্ডল।

প্রভাকর।

সীতার বিরহে রামের বিলাপ।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে যাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন না জানাইয়া জানকী আমায়॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি প্রয়াস॥
রাজ্যচ্যুত দেখিয়া আমারে চিন্তান্বিতা।
পৃথিবী হরিলেন কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদি আমি হইয়াছি বটে।
তথাপিও রাজলক্ষ্মী ছিলেন নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী লুকায় যেমন জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥

কমলকলিকা প্রায় জনকদুহিতা!
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥ রামায়ণ।

বাতাস।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত। এই বায়ুরাশির উর্দ্ধসীমা ২২। ২৩ ক্রোশ হইবে। বায়ু না থাকিলে যে প্রাণী মাত্রেই প্রাণধারণ করিতে পারিত না, ইহার উল্লেখ করা বাহুল্য। যদিও কোন উপায়ে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত, তথাপি বায়ুর অসদ্ভাবে আমাদিগকে যারপর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত; বায়ু না থাকিলে অগ্নির উৎপত্তি হইত না, বায়ু বিরহে বারিবর্ষণও হইত না। নীলনভঃস্থলের প্রীতিকর স্নিগ্ধ শোভা, উষা সতীর অনুপম সুপ্রসন্ন মুখচ্ছবি বা পশ্চিমদিগ্বিভাগের সায়ংকালীন অপূর্ব্ব কাঞ্চনচ্ছটা, যাহাতে নয়নমন হরণ করে, এ সমস্ত বায়ুরাশির প্রভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিশাবসানে সূর্য্যগ্রহ একবারে ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন গগণমণ্ডলে আসিয়া উদিত হইতেন, এবং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রামে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেন, আবার রাত্রি সমুপস্থিত হইলে একবারে নিবিড় অন্ধকাররাশিতে টুপ

করিয়া নিমগ্ন হইতেন। মলয়ানিল আর স্পর্শেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিত না, মল্লিকা, মালতী বা কমল, কদম্ব, কুন্দও আর সুগন্ধ বিতরণ করিত না। এই কোলাহলপূর্ণ পৃথিবী নিঃশব্দে অবস্থান করিত। কি প্রাণাধিক সন্তানের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদুমধুর ভাষিত, কি প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যার শ্রবণতর্পণ সুললিত বচন-পরম্পরা, কি অশেষ দুঃখ বিঘাতক বন্ধুগণের সদালাপ, কি আত্মোন্নতিসাধক ধর্ম্মসংগীত কিছুই আর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

বায়ু এক প্রকার তরল পদার্থ, এবং অপরাপর তরল পদার্থ সকল যে নিয়মের অধীন বায়ুও তাহার বশীভূত। যদি কোন পুষ্করিণী বা নদী হইতে এক কলস জল লওয়া যায়, তাহা হইলে জলাশয়ের কোন স্থানই শূন্য হয় না, যে স্থান হইতে জল লওয়া যায়, সেই স্থান পার্শ্বস্থ জল দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। ইহা সমান পেষণ ধর্ম্মেই ঘটিয়া থাকে।

জলের ন্যায় বায়ুর ও সর্ব্বত্র সমান পেষণ। এই পেষণের প্রমাণ জলের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি একটী বাক্স জল পূর্ণ করিয়া রাখা যায়, আর পরে ঐ বাক্সের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত ছিদ্র দিয়া সমান বেগে জল বাহির হইতেছে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, জলের পেষণ বা বহির্গমনপ্রবলতা সর্ব্বত্রই সমান। যদি দুইটী শূন্যগর্ভ বোতলের মুখে ছিপি দিয়া গভীর সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন করা যায়, এবং একটী অধোমুখে ও অপরটী উর্দ্ধমুখে থাকে, তাহা হইলে উপরিস্থিত জল-

রাশির পেষণে ঐ দুইটী ছিপিই বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। আপাততঃ অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কেবল ঊর্দ্ধমুখ বোতলটীতেই ঐ রূপ ঘটিবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঘটে না। এই প্রক্রিয়া দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, জলরাশির যে কোন স্থান পরীক্ষা কর সকল স্থানেই তাহার ঊর্দ্ধ অধঃ ও পার্শ্ব চতুর্দ্দিকেই সমান পেষণ থাকে। সুতরাং,কোন জলাশয় হইতে কিঞ্চিৎ জল লইলে সেই স্থান যেমন শূন্য হইবার উপক্রম হয়, অমনি পার্শ্বস্থ জল, পার্শ্ব পেষণ বশতঃ ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। সমসংস্থিত জলরাশির মধ্য হইতে যদি কিয়ৎ পরিমাণ জল লওয়া যায়, তাহা হইলে শূন্য স্থানের প্রতিপেষণ থাকে না, কিন্তু চতুর্দ্দিগস্থ জলের পার্শ্ব পেষণ অব্যাহত থাকে বলিয়া এরূপ ঘটিয়া থাকে।

তরল পদার্থের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত লঘু বস্তু থাকে না, ভাসিয়া উঠে, তাহারও কারণ এই। জলের মধ্যে সোলা ডুবাইয়া রাখিলে সমসংস্থানের ব্যাঘাত হয়। জলনিমগ্ন সোলা যে স্থান ব্যপিয়া থাকে, পূর্ব্বে সেই স্থানে জল ছিল; তখন সমসংস্থান ছিল,অর্থাৎ ঊর্দ্ধপেষণ, অধঃপেষণ ইত্যাদি সমান ছিল ; কিন্তু জলের পরিবর্ত্তে সোলা রাখিলে ঊর্দ্ধে তুলিবার পেষণ সমান থাকে, কিন্তু সোলার লঘুত্ব হেতু অধঃ পেষণের লাঘব হয়, সুতরাং সমসংস্থানের ব্যাঘাত জন্মে, এবং ঊর্দ্ধে পেষণ বশতঃ ঐ লঘু পদার্থ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়।

অপর, কি কঠিন কি তরল কি বাষ্পীয় সমুদায় পদার্থই তাপদ্বারা ব্যাকুচিত হইয়া থাকে। ব্যাকুচিত পদার্থের পরমাণু সকল অপেক্ষাকৃত বিরলসন্নিবিষ্ট হয়, সুতরাং

কোন উত্তপ্ত পদার্থ সমায়তন শীতল পদার্থ অপেক্ষা লঘু হয়।

তুলা পর্ব্বতপ্রমাণ রাশিকৃত করিয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে নিম্নের তুলা উপরিস্থ তুলার পেষণ বশতঃ অপেক্ষাকৃত সান্দ্র হইয়াছে। বায়ুরাশিতেও সেইরূপ। পৃথিবীর সন্নিহিত বায়ু ঊর্দ্ধের বায়ু অপেক্ষা অনেক সান্দ্র, সুতরাং গুরু। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়াও সহজ।

পর্ব্বতের উপরে বা ব্যোমযানে উঠিয়া যদি একটী পাত্র করিয়া ঊর্দ্ধের বায়ু আনা যায়, তবে ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, সে বায়ু পৃথিবীর সন্নিহিত বায়ু অপেক্ষা লঘু। ইহার অনেক প্রকার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যদি একটী পাত্রে (কাচ পাত্র হইলেই ভাল হয়) পরিষ্কৃত জল রাখা যায়, এবং জলের মধ্যে কতকগুলি করাতের গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া ঐ পাত্র অগ্নির উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ গুঁড়াগুলি জলের মধ্য হইতে একবার উপরে উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই পাত্রের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে নিম্নে নামিতেছে। অন্নাদি পাকের সময়েও ঐ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ব্যাপারের কারণ এই যে, অগ্নির উত্তাপে পাত্র উত্তপ্ত হইতেছে, ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া পাত্রসংলগ্ন জলবিন্দু সমূহকে উত্তপ্ত করিতেছে, সুতরাং ঐ বিন্দুগুলির আয়তন বর্দ্ধিত ও লঘু হইয়া পড়িতেছে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লঘুদ্রব্য মাত্রেই গুরু-দ্রব্যের উপরিভাগে উঠে। অতএব উত্তপ্ত জলবিন্দু সকল ঊর্দ্ধ-দিকে উঠিতে থাকে। আর জল অত্যন্ত মন্দপরিচালক বলিয়া

পাত্রের উপরিস্থ জলবিন্দু সকল সে পরিমাণে উত্তপ্ত হয় না। ঊর্দ্ধগামী উত্তপ্ত জলবিন্দু অপেক্ষা উপরিস্থ জলবিন্দুগুলি শীতল ও গুরু থাকে, সুতরাং যেমন নিম্নস্থ উত্তপ্ত লঘু পরমাণু সকল উপরে উঠে, সেইরূপ উপরিস্থ শীতল পরমাণুগুলি গুরুত্ব বশতঃ নিম্নগামী হয়, পাত্রের মধ্যস্থ হইতে লঘু পরমাণুগুলি গুরুত্ববশতঃ নিম্নগামী হয়; পাত্রের মধ্যস্থল হইতে লঘু পরমাণুগুলি উঠিতে থাকে, গুরু পরমাণুগুলিও উহার পার্শ্ব দিয়া নিম্নে নামিয়া উহাদের স্থান অধিকার করিয়া লয়। নিম্নাগত বিন্দুগুলি আবার উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে এবং উপরিস্থ বিন্দুগুলিও আবার নিম্নে নামিতে থাকে। পরমাণু সমূহের এইরূপ ঊর্দ্ধাধোগমনকে আমরা সচরাচর "ফুটা" কহিয়া থাকি।

বায়ুর একটী ধর্ম্ম এই যে, উহা সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হয় না, পৃথিবী যে পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, তৎ সংলগ্ন বায়ুও সেই পরিমাণে তাপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঊর্দ্ধের বায়ু সেরূপ তাপ পায় না। এই নিমিত্ত যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই বায়ুর তাপের হ্রাস হইতে দেখা যায়। নানা কারণে ঊর্দ্ধের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। কেহ কেহ বলেন পৃথিবী হইতে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫০০ ফুটে ১০৪০ তাপাংশের হ্রাস দৃষ্ট হয়, কিন্তু আধুনিক ব্যোমযাত্রিকেরা বলিয়াছেন যে, বায়ুর তাপাংশহ্রাসের নিয়ম নাই।

বায়ুর সঞ্চরণকে বাতাস কহে। যে কারণে বায়ুরাশির সমসংস্থান বিনষ্ট হয়, সেই কারণে বাতাস হইয়া থাকে। তাপ ঐ সমসংস্থান নাশের কারণ। শীতকালে গৃহের

মধ্যে হঠাৎ যদি অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়, এবং সেই অগ্নিতে এক খণ্ড বস্ত্র দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, গৃহের মধ্যস্থলে যাহারা উপবিষ্ট আছেন তাহারা এই দগ্ধ বস্তুর গন্ধ পাইবার পূর্ব্বে শীতল ভিত্তি ও বাতায়নের নিকটস্থ ব্যক্তি ঐ গন্ধ অনুভব করেন। আর যদি গৃহ মধ্যে অনেক গুলি তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, সকল গুলিতে পারদ সমান চিহ্নে উঠিতেছে না; অন্তঃছাদের নিকটস্থ যন্ত্র গুলি যে চিহ্ন দর্শাইবে, কুট্টিমের সন্নিহিত গুলি তদপেক্ষা অন্ততঃ ১০ চিহ্ন কম দেখাইবে। এই দুই পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অগ্নির তাপবশতঃ তদুপরিস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি হয়, পরে অন্তঃছাদ হইতে শীতল ভিত্তির নিকট দিয়া বাতায়নের নিকট উপস্থিত হয়; তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক শীতল হইয়া, ক্রমে কুট্টিমে আইসে এবং পুনর্ব্বার অগ্নির উপর গিয়া উত্তপ্ত হয়, সুতরাং পূর্ব্ববৎ আবর্ত্তন করিতে থাকে।

আমাদের অভিধানে বায়ুকে অগ্নিসখ কহে। পদার্থ বিদ্যা দ্বারা আমরা ঐ নামের সার্থকতা দেখাইতে পারি। প্রথমতঃ, বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে অগ্নির উৎপত্তি হয় না, বায়ু সমাগম রোধ করিবা মাত্র অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে খানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, সেই খানেই বাতাস হইয়া থাকে। গৃহদাহের সময় যেন কোথা হইতে বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার কারণ এই যে, অগ্নির তাপে নিকটস্থ বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং পার্শ্বাস্থ শীতল বায়ু সেই স্থান পরিপূরণার্থ সেই দিকে ধাবমান হয়।

বায়ুর এই রূপ ধাবমান ক্রিয়াকে বাতাস বলে। এই রূপে বায়ুর সঞ্চলন হওয়াতে যে গ্রামে অধিক পরিমাণে গৃহ দাহ হয়, সে গ্রামের বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সাহেবদিগের গৃহে এক একটী অগ্নিস্থান থাকে; উহাতে যে কেবল তাপ সেবন হয় এমত নহে, বায়ুরও পরিশোধন হইয়া থাকে। অপরাহ্নে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার পর যদি খুলিয়া দেওয়া যায় এবং ঐ দ্বারের উচ্চ, মধ্য ও অধঃ তিন স্থানে তিনটী প্রদীপ ধরা যায়, তাহা হইলে প্রথম দীপটীর শিখা বহির্মুখ হইবে, দ্বিতীয়টীর শিখা নিশ্চল থাকিবে এবং তৃতীয়টীর শিখা গৃহাভিমুখ হইবে। ইহার কারণ এই যে, গৃহরুদ্ধ উষ্ণ ও সুতরাং লঘু বায়ু দ্বারদেশের উপর দিয়া বহির্গমন করে এবং বহিঃস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু দ্বারের নিম্ন দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, মধ্যস্থানে বায়ুর সঞ্চলন হয় না, সুতরাং শিখা অবিচলিত থাকে।

গৃহমধ্যে বায়ুসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর চতুঃপার্শ্ব ব্যাপ্ত মহাগভীর বায়ু সমুদ্রেও অবিকল ঐ নিয়ম বর্ত্তমান আছে। বিষুব রেখার সন্নিহিত প্রদেশ পৃথিবীর সর্ব্বস্থান অপেক্ষা উত্তপ্ত, সুতরাং সেই স্থানের বায়ুও অন্যান্য স্থানের বায়ু অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠে। উহার উপরিস্থ বায়ু সেরূপ উত্তপ্ত নহে, সুতরাং নিম্নস্থ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে এবং সমকোটিবন্ধের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতে থাকে।

এই রূপ কার্য্য কারণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং সমকোটির বায়ু যেমন উষ্ণ কোটিতে আসিয়া

উপস্থিত হইতেছে, তেমনই মেরুস্থ অতি শীতল বায়ুও আবার সমকোটিতে যাইতেছে। অতএব, উত্তর গোলার্দ্ধে বায়ু চিরকালই সুমেরু হইতে বিষুব রেখার দিকে ধাবিত হইতেছে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বায়ু কুমেরু হইতে বিষুব রেখার দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

এদিকে ঊর্দ্ধমুখ বায়ু ক্রমে যত উঠিতে থাকে, ততই উপরিস্থ বায়ুরাশির অল্পতা হেতু অল্প পরিমাণে পেষণ পাইয়া থাকে এবং বায়ু স্বতঃ ব্যাকোচশীল বলিয়া তাহার আয়তন বাড়িতে থাকে। সঙ্কোচকালে সকল পদার্থের অন্তর্গত তাপের বিকাশ হইতে থাকে এবং ব্যাকোচকালে তাপের অন্তর্দ্ধান হয়; এমন কি হঠাৎ বায়ু সংকুচিত করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয় ও ব্যাকুচিত করিলে বিষম শীতলতার উৎপত্তি হয়। এই কারণ বশতঃ ঊর্দ্ধগামী বায়ু ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, পরে যখন সমতাপযুক্ত বায়ুস্তরে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎক্ষণ জলের উপর তৈলের ন্যায় ভাসমান থাকে, অনন্তর মেরু অভিমুখ হইয়া পড়ে। মেরুর শীতল বায়ু উষ্ণ কোটিবন্ধে আসিতে থাকে, সুতরাং সে স্থান বায়ু শূন্য হইবার উপক্রম হয়, অতএব ঐ উষ্ণ কোটিবন্ধোত্থিত শীতলীভূত বায়ু সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়;—কিয়দংশ সুমেরু ও কিয়দংশ কুমেরুর দিকে প্রবাহিত হয়। অতএব সুমেরু ও কুমেরু হইতে যেমন চিরকাল বিষুব রেখার দিকে বায়ু আসিতেছে, বিষুব রেখা হইতেও তেমনই চিরকাল সুমেরু ও কুমেরুর দিকে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে।

মেরুস্থ বায়ু যত বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহা অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হয়, সুতরাং ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। অতএব যে বাতাস সুমেরু ও কুমেরু হইতে বিষুব রেখার দিকে বহিয়া থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ভূমি হইতে অধিকতর ঊর্দ্ধে উঠে এবং ঐ কারণেই উষ্ণ কোটিবন্ধ হইতে যে বায়ু মেরু অভিমুখে বহিয়া থাকে, তাহা ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া থাকে।

উপরে যাহা নির্দ্দেশিত হইল, তদ্দ্বারা এইটী প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বায়ুসমুদ্রে চিরকাল চারিটী প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে ; দুইটী প্রবাহ মেরু হইতে বিষুব রেখার দিকে নিম্নে প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং অপর দুইটী বিষুব রেখা হইতে মেরু অভিমুখে ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, উত্তর গোলার্দ্ধের লোক চিরকালই উত্তরে বাতাস এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধের লোক চিরকালই দক্ষিণে বাতাস ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি নিবন্ধন সুমেরু হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা উত্তরের বায়ু বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, ঈশান কোণ হইতে বহিতেছে বোধ হয়। ইহার কারণ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যাইতেছে।

পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। পৃথিবী যেমন ২৪ হোরায় একবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, বায়ুরাশিও ঐ সঙ্গে একবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থান সমান জবনতায় ঘর্ণিত হয় না, মেরুসন্নিহিত অক্ষ-

বৃত্তের জবনতা অপেক্ষা বিষুব রেখার জবনতা অধিক। ৩০ অক্ষবৃত্ত হইতে যে বায়ু প্রস্থান করিয়া ২৯ অক্ষবৃত্তে যায়। তাহার আবর্ত্তনের জবনতা ৩০ অক্ষবৃত্তোচিতই থাকে, সুতরাং ২৯ অক্ষবৃত্তের জবনতা তদপেক্ষা অধিক বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন করিতে পারে না, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে। আমরাও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতে থাকি, উপরিস্থিত বায়ুও সেই দিকে আবর্ত্তন করিতে থাকে বটে, কিন্তু উহার জবনতার ন্যূনতা হেতু উহাকে পূর্ব্ব বায়ু বলিয়া বোধ হয়। যদি আমরা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানের দিকে যাইতে থাকি, আর তখন যদি বায়ুর সঞ্চলন মাত্র না থাকে, তবে আমরা বিলক্ষণ উত্তরে বায়ুর অনুভব করিয়া থাকি। মনে কর যে তখন দক্ষিণে বায়ু বহিতেছে। শকটের জবনতা ১৫ মাইল, বায়ুর জবনতাও ১৫ মাইল, তাহা হইলে আমরা বাতাস অনুভবই করি না; কিন্তু যদি বায়ুর জবনতা ১০ মাইল হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ৫ মাইল বেগবৎ উত্তর বায়ুর অনুভব করিতে হয়। এই নিমিত্ত সুমেরু হইতে আগত বাতাসকে আমাদিগের উত্তর বায়ু বলিয়া বোধ না হইয়া উত্তরপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। যতই ঐ বায়ু বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই উহা অপেক্ষাকৃত অধিক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে থাকে এবং ততই উহা পূর্ব্ব বায়ু বলিয়া প্রতীত হয়। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবিকল ঐ কারণে দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ুর অনুভব হয়। এই দুইটী বায়ু চিরকাল বহিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়, এই নিমিত্ত ইহা-

দিগকে বাণিজ্য বায়ুবলিয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ১০ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উত্তর ভাগের বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয়, ও দক্ষিণ ভাগের বাণিজ্য বায়ু নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে ১০ অংশ হইতে ২৮ অংশ পর্য্যন্ত স্থানে প্রবাহিত হয়।

সুমেরু হইতে আগত বায়ু প্রবাহ যেমন ক্রমে উত্তর-পূর্ব্বীয় ও অবশেষে পূর্ব্বীয় হইয়া পড়ে, এবং কুমেরু হইতে আগত বায়ু প্রবাহ যেমন ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বীয় ও পূর্ব্বীয় হইয়া পড়ে। বিষুব রেখা হইতে যে প্রবাহদ্বয় কেন্দ্রান্তি-মুখে গমন করে তাহারাও তেমনই দক্ষিণ পশ্চিমে ও পশ্চিমে এবং উত্তর পশ্চিমে ও পশ্চিমে হইয়া পড়ে।

বিষুব রেখার নিকটে ঐ বাণিজ্য বায়ুদ্বয় ক্রমশঃ পূর্ব্ব বায়ু রূপে পরিণত হইয়া উর্দ্ধে মিলিত হয়। ঐ স্থানে সর্ব্বদাই বায়ু উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, কখন কখন ঐ স্থান একবারে নির্ব্বাত হইয়া পড়ে এবং কখন কখন প্রকাণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে আন্দোলিত হইয়া থাকে। ঐ স্থান "নির্ব্বাত ও ঝঞ্ঝাকোটি" নামে আখ্যাত। ঐ কোটিবন্ধের নিকট উপস্থিত হইলে নাবিকেরা শশব্যস্ত হইয়া পড়ে। ঐ কোটি-বন্ধ নিরক্ষবৃত্তের কিঞ্চিৎ উত্তর, কখন ৬ কখন ১০ অংশ ব্যাপিয়া থাকে।

পৃথিবীর স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ বায়ু বহিয়া থাকে। আমরা বাতের সাধারণ কারণ মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম। উক্ত বিশেষ বিশেষ বায়ুর বর্ণন বা কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে আমাদের দেশে কি কারণে শীত

কালে উত্তরে বায়ু ও গ্রীষ্মকালে দক্ষিণে বায়ু বহিয়া থাকে তদ্বিষয়ে স্থূল স্থূল দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

সূর্য্যতাপে স্থল যেরূপ উত্তপ্ত হয়, জল সেরূপ হয় না, স্থল অপেক্ষা জল অনেক শীতল থাকে। আবার রাত্রিকালে স্থল যেমন শীঘ্রই শীতল হইয়া পড়ে; জল সেরূপ হয় না। এই নিমিত্ত দ্বীপ সমূহে প্রত্যহ দুই প্রকার বায়ু বহিয়া থাকে। দিবা ভাগে সমুদ্রজল অপেক্ষা দ্বীপ উত্তপ্ত হয়, সুতরাং তথাকার বায়ু ঊর্দ্ধগামী হয় এবং পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূর্ণ করে। এই নিমিত্ত দিবাভাগে দ্বীপোপরি সমুদ্রবায়ু বহন করে। রাত্রি হইলে সমুদ্রজল দ্বীপাপেক্ষায় উষ্ণ থাকে, সুতরাং তখন দ্বীপ হইতে সমুদ্রের দিকে বাতাস বহিয়া থাকে। উপকূলেও ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বাণিজ্য বায়ুর কার্য্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি,তাহাতে পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে,আমাদের দেশে ৬ মাস অন্তর বায়ুর পরিবর্ত্তন না হইয়া চিরদিন উত্তর পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থান যেরূপ তাহাতে বাণিজ্য বায়ু বহিতে পায় না। দক্ষিণে বিস্তৃত ভারত সাগর রহিয়াছে, উহার কোন পার্শ্বে আর স্থল নাই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান উষ্ণকোটি বন্ধে সংস্থিত; সুতরাং যদিও ভারত সমুদ্র বিষুব রেখার নিতান্ত সন্নিহিত, তথাপি গ্রীষ্মকালে সমুদ্রজল অপেক্ষা ভারতবর্ষ অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া থাকে। অতএব গ্রীষ্মকালে সমুদ্র বায়ুই বহিয়া থাকে, অর্থাৎ দক্ষিণ বায়ু প্রবল

হয়। শীতকালে আবার উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ঘটিয়া থাকে। তখন উত্তরে বায়ু প্রবল হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতিবশতঃ এই বাতাসদ্বয় ক্রমশঃ দক্ষিণপশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে হইয়া পড়ে। মালব ভাষায় "মুসম" শব্দে ঋতু বুঝায়, তাঁহা হইতে পারস্য ভাষায় ঐ বায়ুর নাম মৌস্থম হইয়াছে, ইংরাজেরা ইহাকে মন্সুম বলেন। জাবা প্রভৃতি দ্বীপে ঐ বায়ুদ্বয় যথা নিয়মে বহিয়া থাকে। যখন মন্সুমের দিক্ পরিবর্ত্তন হয়, তখন কিয়দ্দিন ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে ও বৈশাখী ঝড় আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ আছে।

ঘূর্ণবায়ুর নিয়মগুলি সংপ্রতি মাত্র স্থির হইয়াছে। ঐ নিয়মগুলি অতিশয় দুরূহ এবং ব্যাখ্যা করিবারও স্থান নাই। তবে এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, যখন ১৬০০ মাইল পরিধিযুক্ত বায়ুরাশি মহাবেগে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, এবং ঘুর্ণিত হইতে হইতে ঘোরায় প্রায় ২৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে, তখন তাহার পরাক্রমের যে সকল অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা কোন ক্রমেই অবিশ্বাস্য নহে। উত্তর আমেরিকার পূর্ব্বদিক্ ও ভারত সাগর উহার প্রধান আক্রমণের স্থান। ঘূর্ণবায়ুর একটী আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, উত্তর গোলার্দ্ধে ঘূর্ণবায়ু পূর্ব্ব হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে উত্তরপশ্চিম দিকে চলিয়া যায়, এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে পশ্চিম হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। এক জন পদার্থবিৎ পণ্ডিত এই নিয়ম দেখিয়া তড়িতের দ্বারা ঐ

রূপ কার্য্য হইয়া থাকে বলিয়া যে অনুভব করিয়াছেন, তাহা অনুভবসিদ্ধ বোধ হয়। যাহা হউক, নাবিকদিগের এই নিয়ম জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; ইহা জ্ঞাত থাকিলে তাঁহারা ঐ ঘূর্ণবায়ুর মহাভীষণ কেন্দ্রমুখের অবস্থান বুঝিতে পারেন এবং তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় করিতে পারেন।

কোন ইন্দ্রিয়জিত সম্রাটের প্রতি এক জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানীর উক্তি।

"আমার সমান তুমি কোন্ গুণে হবে।
দাস অনুদাস মম যেহেতু সম্ভবে॥
ইন্দ্রিয় ও রিপু মোর দুই দাস আছে।
দাস হয়ে তুমি তাদের ফির পাছে পাছে॥
প্রথমে প্রভুত্ব কর আপন উপর।
তার পর কর গিয়া অন্যের উপর॥
সে কেমনে হবে প্রভু যায় ছয় প্রভু।
ছয়ের দাস দাস বই কেন হবে প্রভু?।
রূপেতে সোনার কীট গুণেতে কাঁটার।
অনিদ্রা আপদ ভয় উদ্বেগ আধার॥
সুবর্ণ কোমলাসন ময় সিংহাসন।
ভাবিতে ভাবিতে হয় কণ্টক আসন॥
লোভ ত্যজ তবে সত্য করিলে রাজত্ব।
যেহেতু অলোভিশির সর্ব্বদা উন্নত॥

মাটি হতে দেহ তব মাটি হতে হবে।
কিসে অহঙ্কার কিসে অগ্নিশর্ম্মা তবে ॥
মাটি হতে হবেই হবে যদি সত্য জান।
মাটি হওয়ার আগে তবে মাটি নয় কেন ? ॥
মাটি হতে হইয়াছে মনুষ্যের ভাব।
সেই তো মনুষ্য যার মাটির স্বভাব ॥
মৃত্তিকাত্ব-হীন নর মনুষ্য কি হয় ?।
গন্ধহীন চন্দন ইন্ধন বই নয় ॥
সংসার বিষের বৃক্ষ বিষ ফলময়।
তথাপি ফলিছে তাতে সুধা ফলদ্বয় ॥
একতার বিদ্যারূপ রসের আস্বাদন।
অন্যতার সজ্জনের সঙ্গেতে মিলন।
পরমুখে কটুভাষা সহিতে না পার।
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর ॥
দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল।
ধনিকে করিলে দান নাহি কিছু ফল ॥
রোগীর ঔষধ পথ্য অরোগীর নয়।
বুনা ক্ষেত্রে বুনা বীজ করা অপচয় ॥
অতি উষ্ণ হয়োনাক স্নিগ্ধ হতে হবে।
অত্যুন্নত হয়োনাক নত হতে হবে ॥
উত্তাপে উন্নত বাস্প আক্রমে গগণ।
জল করে ফেলে তারে অধোতে তপন ॥
মম নিন্দা করে যদি কেহ হয় তুষ্ট।
আমিও তাহাতে তুষ্ট নহি কভু রুষ্ট ॥

শ্রম ব্যয় করে লোক তুষ্টি জন্যে কত।
অমনি হইবে তুষ্ট আরো ভাল এতো॥
(অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পাপ আত্মার পীড়ন।
অপরাধীনতা মুক্তি, স্বর্গ বাঞ্ছার পূরণ)॥
অপরাধী ব্যক্তি প্রতি যদি ক্রোধ হয়।
ক্রোধের উপরে ক্রোধ কেন তবে নয়?॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ ফল।
সে ফল বঞ্চিয়া ক্রোধ দেয় মন্দ ফল॥
নরের স্বভাব যেন মার্জ্জিত দর্পণ।
যেমন দেখাবে তারে দেখাবে তেমন॥
অন্য হইতে চাহ তুমি যেই ব্যবহার।
করিও তাহার প্রতি সেই ব্যবহার॥
যে জন করয়ে ভাল, করে আপনার।
যে জন করয়ে মন্দ করে আপনার॥
দোষ দৃষ্ট তবু সৎ রাখেন গোপনে।
অদৃষ্ট তথাপি দুষ্ট রটায় যতনে॥
করোনাক অপকার কর উপকার।
এই ধর্ম্ম এই কর্ম্ম সংসারের সার"॥

আকাশ।

মরি মরি! কি মাধুরী আকাশের শোভা।
যেন কোটী হীরা খণ্ড রয়েছে গ্রথিত;
মধ্যে মধ্যে বিরাজিত নীলবর্ণ আভা,
যথা নীল সরসীতে পদ্ম প্রফুল্লিত।

ক্ষণে শ্বেত, ক্ষণে পীত, ক্ষণে বা হরিত,
দেখিতে দেখিতে হয় অভিনব মনে ;
কখন উড়িছে পাখী হয়ে হরষিত,
কখন বা কাদম্বিনী ঢাকিছে গগণে।

কখন করিছে যুদ্ধ কাদম্বিনী দলে,
অশনি সায়ক তার পড়িছে ভূমিতে ;
মুহূর্ত্তে সে ভাব ছাড়ি পুনঃ কুতূহলে
চলে সব মেঘাবলী বর্ষণ করিতে।

মোহিত হয়েছি আমি শুন হে আকাশ ?
কেমনে তোমার মাঝে চরে মেঘদলে ?
জগত ব্রহ্মাণ্ড করে তোমাতে নিবাস
মোদের অবনী মাতা আছে তব কোলে।

ধরায় পতিত যবে মাতৃগর্ভ হতে,
তদবধি রূপ তব করি নিরীক্ষণ ;
পারিনা পারিনা তবু তুলনা করিতে,
করিতে তোমার অন্ত মুগ্ধ হয় মন।

জনম অবধি আমি হেরি হে তোমায় ?
কেন যে তোমার রূপ নহে পুরাতন ?
কে স্থজিল তব রূপ বল হে আমায় ?
যখন দেখিতে পাই তখনি নূতন।

যে জন করিল চিত্র তোমার অঙ্গেতে,
শ্বেত, পীত, নীলবর্ণে করিয়া রচন ;
আমার মানস হয় তাঁহারে দেখিতে,
দেখিব দেখিব বড় আছে আকিঞ্চন।

হায়! ঐ অনন্ত দেহ যাঁহার রচিত,
না জানি তোমার নভ! মহিমা কেমন!
নিখিল জগত আছে যাঁহার আশ্রিত,
দেখিতে তাঁহার রূপ ব্যাকুলিত মন।

এডুকেশন গেজেট।

CALCUTTA

শব্দ।

সকল জড় পদার্থই পরমাণুপুঞ্জে নির্ম্মিত। পরমাণুগুলি দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট হইলেই পদার্থ কঠিন, আর তাহাদের শৈথিল্য থাকিলেই পদার্থ মৃদু হয়। পরমাণু সকল এত সূক্ষ্ম যে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ নয়নগোচর হয় না, এবং অদ্যাপি কেহই তাহাদের পরিমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই অজ্ঞাতস্বরূপ পদার্থের "পরমাণু" এই নামকরণ করিয়াছেন। কোন জড়পিণ্ড যতদূর বিভক্ত হইতে পারে, তাহার চরম সীমায় নীত হইলে যে অতি অন্তিম অণু অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই পরমাণু কহে।

যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধে প্রায় ২৩ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং জলে যেমন মৎস্যেরা বিচ-

রণ করে, সেইরূপ আমরাও যাহার মধ্যে সতত বাস করিতেছি তাহাও পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। বায়বীয় অণুগণ সুসংশ্লিষ্ট নহে। তাহারা সকলেই দূরে পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। তাহাদের পরস্পর অন্তর অন্ততঃ স্বীয় আয়তনের শত গুণ হইবে। এই নিমিত্ত আমরা বায়ু দেখিতে পাই না। কিন্তু যদি অধিক পরিমাণে বায়ুকে বিলক্ষণ রূপে সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তদীয় অণুসকল পরস্পর অতি সন্নিহিত হওয়াতে, বালুকাকণার ন্যায় স্থূল হইতে পারে, সুতরাং তদবস্থায় আমরা বায়ু দেখিতে সমর্থ হই।

যেমন বহুতর ইষ্টক-সংযোগে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, সেই রূপ অসংখ্য পরমাণু সংযোগে সমুদায় জড়পিণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইষ্টকগুলি সংযুক্ত করিতে যেমন সংযোগ-সাধক পদার্থান্তরের-(চূর্ণ, সুরকি, ইত্যাদির) আবশ্যকতা থাকে, পরমাণু সংযোগ স্থলে সে রূপ কোন সামগ্রীরই প্রয়োজন হয় না। আকর্ষণশক্তিই সেই কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। পরমাণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকমণির ন্যায় পরস্পর আকর্ষণ করিয়া স্বতই একত্র মিলিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরস্পর সংস্পর্শ ঘটিতে পারে কখনই তাহারা এরূপ সন্নিহিত হয় না। কোন পদার্থেরই এত সান্দ্রতা নাই যে উপযুক্তরূপ বল প্রয়োগ করিলে তদীয় অণুগণকে অধিকতর সন্নিকৃষ্ট করিতে না পারা যায়। আঘাত পাইলে সীসের অণুসকল যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সান্দ্রভাব অবলম্বন করে, সেইরূপ অন্যান্য পদার্থেরও কিছু না কিছু সান্দ্রত্ব বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। জড়পিণ্ড পুনঃ পুনঃ

আহত হইলেও তদীয় অণুসকল পরস্পর সংস্পৃষ্ট হয় না কেন, ইহা অদ্যাপি নিঃসংশয়িত রূপে নিরূপিত হয় নাই। বোধ হয় জড়পিণ্ডে যে অনুভূত তেজঃ (Latent heat) নিত্য বিদ্যমান আছে, তাহার বিস্ফারণ শক্তিরূপ (Power of Expansion) প্রতিকূল বল দ্বারাই উহাদের পৃথক্‌ভাব অব্যাহত থাকে। সীস প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের পরমাণু বলপূর্ব্বক আহত হইলে, পূর্ব্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়া, এক নূতন স্থানে আইসে, এবং তথায় অবস্থিতি করে। অন্যান্য কতকগুলি পদার্থের অণুগুলি আঘাতে ঐরূপ অপসারিত হয় বটে, কিন্তু অভিনব স্থানে অবস্থিতি করে না, তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। হস্তিদন্ত প্রভৃতি স্থলে ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে। কঠিন বস্তু আঘাতে ক্ষণমাত্র অবনত হয়, কিন্তু অপসারিত অণুগুলি প্রত্যাগমন করিলেই আঘাতের আর চিহ্ন থাকে না। যে সকল পদার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আঘাতের পরেই সম্পূর্ণরূপে বা বাহুল্যতঃ পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ কহে। স্থিতিস্থাপক পদার্থ বেগে আহত হইলে, তদীয় কম্পিত অণুসকল অব্যবহিত পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থান অধিকার ও পূর্ব্বভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। আঘাত দ্বারা যে পরমাণুগুলি অপসারিত হয়, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণু অপসারিত না করিয়া আপনারা অপসৃত হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগকে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তাহাদের একটী গতি জন্মে, তদ্দারা তাহারা একবার এক পার্শ্বে একবার অপরপার্শ্বে অপসারিত

হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে। আহতপদার্থ কএক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া শান্ত হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণু সমুহের এইরূপ গতি প্রত্যাগতিকে কম্পন (vibration) কহে। স্থিতিস্থাপক পদার্থ আহত হইলে তাহার সর্ব্বাবয়ব কম্পিত হইয়া থাকে। আহত হইলে উক্ত পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু স্বসমপবর্ত্তী পরমাণুকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করে এবং তৎপ্রতিঘাতে নিজেও বিপরীত দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আইসে। এইরূপে তাহাদের যে গতি জন্মে তাহা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়া কম্পন ক্রিয়াকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিতে থাকে; কিন্তু ঐ গতি যত বিস্তৃত হয়, ততই উহার বেগ হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং পরিশেষে ঐ পদার্থের সমুদায় অবয়বে সঞ্চারিত হইয়া নিঃশেষিত হয়।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহিয়াছে। বায়ু, সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু বায়ু নিজে সাতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণুসকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, এবং ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ুমধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়। পাত্রে আঘাত

করিলে তত্রস্থ জলে যে তরঙ্গ উঠে তাহার দ্বারাই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও অবিকল উহাই ঘটে; কারণ তখন জলের পরিবর্ত্তে তথায় বায়ু থাকিবে এবং পূর্ব্বে যেমন জলে কম্পন সঞ্চারিত হইয়াছিল, এক্ষণেও সেইরূপ বায়ুতে সঞ্চারিত হইবে। কম্পাবান পদার্থমাত্র হইতেই কম্পনক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ুমধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাহা বায়ুরাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। যেমন গঙ্গার তরঙ্গ সকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাত করে, সেই রূপ কম্পাবান বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ সংস্থাপিত করা যায়, তাহাও ঐরূপে বায়বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে একতা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া প্রসৃত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনে কর ঐ কাগজ অচেতন তন্তুসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতঃই চৈতন্যবিশিষ্ট অনুভবক্ষম ধমনীসমুহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ ধমনীগুলি সুন্দর রূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। সে যাহা হউক, ঐ প্রকার সজীব ধমনী সকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতি সূক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পান পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনী সমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই আমরা শব্দ কহি। নিকটে কোন

স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলেই শব্দ শুনা যায়। কিন্তু যদি ঐ কম্পবান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শব্দ শুনা যায় না। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হইয়া থাকে।

স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পনাবস্থায় অবস্থিতি হইলেই শব্দ জন্মায়। কারণ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া থাকে। ঢক্কা, বীণা, বেণু প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণুগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ তৎসমুদায় ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয় এই মাত্র। এক সেকণ্ড মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্রবার কর্ণধমনী আহত হইলে তার স্বর শ্রুত হয়, এবং উক্ত সময় মধ্যে আটবার মাত্র হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় শুনা যায় না। আঘাতের সংখ্যার আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্গত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য আঘাতের প্রকার ভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণ বিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

চন্দ্র।

হে বিধু অম্বর পথে সাধিতে কি মনোরথে,
নিত্য আসি দেখা দাও, ধরি রূপ বিমলে ?
আহা কি সুন্দর-কায় ! শরীরের প্রতিভায়,
নিশির তমসরাশি নাশি, বিশ্ব উজ্জলে।

হলে ভানু সুপ্রকাশ, কোথা গিয়ে কর বাস ?
দিবসে তোমার কভু দরশন মিলে না ;
পাইলে সূর্য্যের সাড়া, হয়ে চল দেশছাড়া,
বুঝিতার সহবাসে কভু তুমি ছিলে না।
বুঝিছি এ ভয় আছে, তাপে তনু গলে পাছে,
নিশিতে উদয় হও সূর্য্য অস্ত হইলে ;
ভাল যেন হল ভাই, বল পরে যা সুধাই ;
কভু নিশি মুখে কভু নিশি অর্দ্ধ বহিলে।
কভু পূর্ণ কভু রেখা, কভু অর্দ্ধ কায়ে দেখা,
দাও, কেন ? কি কারণ হেন দশা ঘটিল ?
অমৃত দীধিতি ধর, সন্তাপ শীতল কর,
কি হেতু কলঙ্ক তব বিশ্ব মাঝে রহিল ?।
মৃগ শিশু ধরি অঙ্কে, ডুবিলে কলঙ্ক পঙ্কে,
বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি সাধ্য কার খণ্ডিতে।
এ দুখ ভাবিয়া চিতে, বুঝি অমা রজনীতে,
নির্জ্জন প্রদেশে যাও, আত্ম প্রাণ দণ্ডিতে !
তব দরশন পেলে, হর্ষে পক্ষপুট মেলে,
চকোর গগণে ধায়, সুধাপান মানসে ;
কুমুদ সলিলে ভাসে, তোমায় দেখিলে হাসে,
হৃদাসন বিস্তারিয়া, তিত মুখে সম্ভাষে।
তুষিতে কুমুদ মন, প্রিয়ে প্রেম সম্ভাষণ,
তুমিও করহ শুভ্র কৌমুদির সংযোগে ;
থাকি উচ্চতর ধাম, কুমুদ বান্ধব নাম,
পেয়েছ ভুবনে মাত্র, প্রণয়ের সুযোগে।

গগনে উদিলে তুমি, কেন সিন্ধু বেলা ভূমি,
অতিক্রম করে, এর মর্ম্ম কিবা কে বলে;
বুঝিছি পড়িল মনে, তুমিত কমলাসনে,
উদ্ভূত সাগর হতে, কিম্বদন্তী ভূতলে;
তুমি হে অপত্য রত্ন, তোমায় দেখিলে যত্ন,
পায়, অঙ্কে আনিবার, বেলা বাহু প্রসারি;
তাহাতে পুলকে ভাসি, প্রতিবিম্বচ্ছলে আসি,
অঙ্কের ভূষণ হয়ে, বাঞ্ছা পূর তাহারি।
চলিলে পশ্চিমাচলে, স্বস্থানে যায় চলে,
দুঃখে সিক্ত করি ধরা, নেত্রনীর শিশিরে;
তুমি যবে হও বাম, কে লয় তাহার নাম?
তমস্বিনী বলি লোকে নিন্দে সেই নিশিরে।

প্রতিধ্বনি।

কোন গহ্বর কম্বা গুম্বুজাকৃতি মন্দির মধ্যে শব্দ করিলে, অকস্মাৎ তাহার যে অনুকরণ উদ্ভব হইয়া শ্রুতিপুটে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। ধ্বনি সর্ব্বত্র তুল্য হয় না, স্থান ও কারণ ভেদে ইহার অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। কোন কোন প্রতিধ্বনিতে স্বর মাত্র প্রতিপন্ন করে, কোনতে দুই তিন শব্দ বা এক চরণ কবিতা পুনরুৎপন্ন করে, কোন ওতে বা ঐ এক বা বহু শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে।

ইদানীন্তন দার্শনিক পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ এক প্রকার ঊর্ম্মিমাত্র। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে,

জলের কম্পানে যে প্রকার ঊর্ম্মি উৎপন্ন হয়, বায়ুতে কোন পদার্থ আন্দোলিত হইলে, সেই রূপ বায়ুর কম্পনে ঊর্ম্মি উৎপন্ন হয়, এবং সেই ঊর্ম্মি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাকশেষে আহত হইলে শব্দ জ্ঞান হয়। ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাত স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়া দেখিয়াছেন যে তথায় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বায়ুকে বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া তন্মধ্যে শব্দ করিলে ঐ ঊর্ম্মি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। অপর, ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, সুতরাং কোন দৃঢ় পদার্থে আহত হইলে, তথা হইতে তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হয়; যেমন নদীর স্রোত বা বেগবান্ বর্ত্তুল, কোন পদার্থে প্রতিহত হইলে সহসা প্রত্যাবৃত্ত হয়। শব্দ অর্থাৎ বায়ুর কম্পনও সেইরূপ কোন পদর্থে প্রতিহত হইলে প্রতীপগামী হইয়া থাকে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ ভৃগু বিদ্যমান থাকাতে, বায়ুর কম্পন তাহাতে প্রতিহত ও তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুতরাং, তথায় সুন্দর রূপে প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই কবিগণ প্রতিধ্বনিকে ‘শৈলনিলয়” বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পদার্থবিদ্যার প্রভাবে এখন আমরা উহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু শৈশবাবস্থায় যখন আমাদের স্বমুখবিনির্গত শব্দের প্রতিশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তখন মনোমধ্যে কেমন অকারণ ভয় ও কি অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদেরই উদয় হইত!

আহত পদার্থের দূরত্ব অনুসারে প্রতিধ্বনির আগমনের কাল বিলম্ব হইয়া থাকে। শব্দ, এক সেকণ্ড মধ্যে ১,১৪২

ফুট গমন করে ; সুতরাং, যদি উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধেক দূরে একটী পর্ব্বত থাকে, তাহা হইলে এক সেকণ্ড কাল মধ্যে যে কয়েকটী বর্ণ উচ্চারিত হয়, শ্রোতা তাহাই স্পষ্ট রূপে শ্রবণ করিতে পারেন, কারণ তৎপরে প্রতিধ্বনি আসিয়া বক্তার উচ্চারিত বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। সে যাহা হউক, উক্ত নিয়ম অবগত থাকিলে, আহত পদার্থের দূরত্ব, প্রতিধ্বনি দ্বারা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যদি আমরা একটী নদীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকি, এবং অপর পার্শ্বে একটী পর্ব্বত থাকে, তাহা হইলে প্রতিধ্বনির আগমনের কাল নিরূপণ করিয়া পর্ব্বতের দূরত্ব অর্থাৎ নদীর প্রস্থ অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে। কখন কখন উচ্চ পর্ব্বত হইতে অনেক ক্রোশ দূরে প্রতিধ্বনি পরিচালিত হইয়াছে।

যদি দুইটী পর্ব্বত কিম্বা দুইটী প্রাচীর পরস্পর সমান্তরাল থাকে, তাহা হইলে একটী শব্দে বারম্বার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। অবশেষে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত বায়ুর কম্পন সমূহ যখন ক্রমে মন্দগতি হয়, তখন আর শব্দের অনুভব হয় না। কোন স্থলে (বিশেষতঃ যথায় আহত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে পুষ্করিণী বা হ্রদ থাকে) একটী পিস্তলধ্বনির অন্যূন চল্লিশবার প্রতিশব্দ শুনা গিয়াছে।

চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত থাকিলে, বায়ু কম্পনের প্রতিফলন হয় বলিয়া ঐ রূপ স্থলে গান বাদ্য ভাল লাগিয়া থাকে। কিন্তু কথোপকথোনের পক্ষে উহা উপযুক্ত নহে। এক জন সামান্য বংশীবাদকও একটী গিরিগুহ্বর মধ্যে বংশীবাদন

করিলে তাহাও সুমিষ্ট লাগিয়া থাকে। গীতের তান এক রূপ হইলেও মন্দ মন্দ প্রতিফলিত শব্দ সমূহের সংযোগে তাহা মনোহর হইয়া উঠে।

কেহ কেহ এমন মনে করিতে পারেন যে,যদি বায়ুর কম্পান প্রতিহত হইলেই প্রতিধ্বনি হয়, তাহা হইলে আমাদিগের গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া শব্দ করিলে প্রতিধ্বনির উৎপত্তি হয় না কেন? ইহার কারণ এই যে, আমাদের গৃহ সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং বায়ুর কম্পান সমূহ এত অল্প সময়ের মধ্যে ভিত্তি হইতে প্রতিহত হইয়া আইসে যে, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির ব্যবহিত কাল পৃথক্ রূপে উপলব্ধি হয় না। তবে মন্দির প্রভৃতি স্থানে প্রতিধ্বনি হইবার কারণ কি তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, আলোকের জ্যোতিঃ তীব্রতর করিবার নিমিত্ত অনেক সময় লণ্ঠন প্রভৃতি আলোকাবরণে এক এক খানি বর্ত্তুলপৃষ্ঠ কাচ বা মসৃণ ধাতুফলক সন্নিবেশিত থাকে। আলোক যে নিয়মে প্রতিফলিত হয়, শব্দও সেই নিয়মানুসারে প্রতিধ্বনিত হয়, সুতরাং বর্ত্তুলের কুব্জপৃষ্ঠ নিকটে থাকিলে সুন্দররূপ প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। কখন কখন জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী গিরিগুহাতে শব্দের এরূপ প্রতিফলন হয় যে, উহার অধিশ্রয়ে কর্ণ লইয়া গেলে, বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই নিমিত্তই বৃত্তাকার গৃহের মধ্যস্থলে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

অর্ণবযানের পাইল বায়ুভরে স্ফীত হইলে, উহা শব্দ

প্রতিফলনের উপযোগী হইয়া থাকে। একদা ব্রাজিলের নিকটস্থ সমুদ্রে একখানি অর্ণবযান পাইল ভরে যাইতেছিল; অর্ণবযান তীর হইতে বহু দূরে ছিল, কয়েক জন আরোহী উহার উপর বিচরণ করিতে করিতে অনুভব করিলেন যে, যখন তাঁহারা একটী বিশেষ স্থান (অবিশ্রয়) দিয়া গমন করে, তখন উৎসবের ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একটী শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়। অর্ণবযানের সকলেই ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া ঐ শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথা হইতে শব্দ হইতেছে, কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। কয়েক মাস পরে জানা গেল যে, ঐ দিন ব্রাজিল উপকূলে সেণ্টসালভেডর নগরে উৎসব ঘণ্টা বাজিয়াছিল। ঐ সকল ঘণ্টার শব্দ, মন্দ মন্দ বায়ুর আনুকূল্যে সমপৃষ্ঠ সমুদ্রোপরি, এক শত মাইল দূরে নীত হইয়া, পাইলের উপর পতিত হওত, একটী অধিশ্রয়ে সমবেত হইয়াছিল।

আর্ণ সাহেব বলেন যে, তাঁহার এক জন বন্ধু ডোভরের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানের প্রাচীরের নিকটে বসিয়া ওয়াটারলুর যুদ্ধের কামানের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন। মেঘ দ্বারাও অনেক সময় শব্দের প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

কখন কখন প্রতারক লোকে শব্দের প্রতিফলনের নিয়ম অবগত হইয়া নানা প্রকার আপাততঃ বিস্ময়কর ব্যাপার সমাধা করিয়াছে। কোন স্থানে প্রশ্নকারেরা একটী গৃহে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রশ্ন করিত, এবং একটী গুপ্ত বর্ত্তুলপৃষ্ঠফলক দ্বারা ঐ সকল প্রশ্ন দূরস্থিত প্রতারকের নিকটে নীত হইত। সে ব্যক্তি তথা হইতে যে উত্তর প্রদান করিত,

সেই উত্তর কেবল ঐ প্রশ্ন কর্ত্তার নিকট আসিত। সুতরাং, সকলে ঐ সকল উত্তর দৈববাণী বলিয়া মনে করিতেন।

বৃত্তাভাস ক্ষেত্রের দুইটী অধিশ্রয় আছে। উহার অন্য-তর অধিশ্রয়ে আলোক, তাপ বা শব্দের উৎপত্তি স্থান হইলে, অপর কেন্দ্রে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে; সুতরাং, এক অধিশ্রয়ে বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিলেও অপর অধিশ্রয়ে তাহা প্রতিফলিত হয়। এমন কি দুই জন দুই অধিশ্রয়ে অনায়াসে আস্তে আস্তে পরামর্শ করিতে পারে, তথাচ মধ্যবর্ত্তী লোক তাহার ছন্দাংশও জানিতে পারে না।

কোন কোন সেতুর উভয় পার্শ্বে কোলঙ্গা থাকে। ঐ পরস্পর সম্মুখীন কোলঙ্গা দুইটী এরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যে, দুই জন দুইটী কোলঙ্গাতে বসিয়া অনা-আসে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। পথিকগণ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে কহিতে সেতুর উপর দিয়া চলিয়া যায়, অথচ তাহাদের কথাবার্ত্তা ঐ শব্দে ভঙ্গ হয় না এবং পথিকেরাও তাহাদের পরামর্শ শুনিতে পায় না।

নল দ্বারা শব্দ অধিক দূরে নীত হয়। ইহার কারণ এই যে, বায়ুর কম্পনসমূহ উহার পার্শ্বে বারম্বার প্রতিফলিত হয়, দূরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। শূন্যে শব্দ করিলে বায়ুর কম্পান চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। মসৃণ দেওয়াল অথবা সমপৃষ্ঠ জল কেবল একদিকের ব্যাপ্তি মাত্র নিবারণ করে, অথচ উহার দ্বারা শব্দ কত দূরেই নীত হয়! মসৃণ দেওয়া-লের নিকটস্থ ব্যক্তিরা দূর হইতেও কথোপকথন করিতে পারে এবং হ্রদের নিকট কুকুরের শব্দ কখন কখন সন্ধ্যা-

কালে পাঁচ মাইল অন্তরেও শুনা গিয়াছে। গোলাকার ঘরের দেওয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া দুই জনে পরস্পর দূরস্থিত হইয়া আস্তে আস্তে পরামর্শ করিতে পারে।

দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে শব্দ ভাল শুনিতে পাওয়া যায় কেন, প্রতিধ্বনি সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে এবিষয়ের মিমাংসা হওয়া উচিত নহে, তথাপি কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা এই সাধারণ ব্যাপারের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছি। প্রথমতঃ, দিবা ভাগে অনেক গোলমাল হইতে থাকে; দ্বিতীয়তঃ, দিবা ভাগে সূর্য্যতাপ দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সর্ব্বদা উপরে উঠিতেছে এবং ঊর্দ্ধের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিতেছে। রাত্রিকালে বায়ুস্তরের এরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, প্রায় সকল বায়ুস্তরেই এক রূপ তাপাংশ ও এক রূপ সান্দ্রতা থাকে; সুতরাং এক রূপ সান্দ্রতাযুক্ত পদার্থের মধ্য দিয়া আসাতে শব্দের অধিক হ্রাস হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল, তদ্দ্বারা পাঠকবর্গের মনে অবশ্যই এরূপ ভাবের উদয় হইবে যে, শব্দ ও আলোকের প্রতিফলন প্রভৃতির নিয়ম যখন এক রূপই হইল, তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় দূরশ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে; ফলতঃ, দূরশ্রবণের যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রপ্রসাদাৎ যেমন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নূতন চক্ষু হইয়াছে, শ্রবণবিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারাও তেমনই বধিরের কর্ণ হইয়াছে বলিলেই হয়। ক্ষীণ শ্রবণ ব্যক্তিদিগের ব্যবহার নিমিত্ত এক প্রকার শিঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছে,

ঐ শিঙ্গার যে মুখে শব্দ প্রবেশ করে তাহা প্রশস্ত, যে মুখ কর্ণে সংলগ্ন করা হয় সে মুখ সংকীর্ণ; পার্শ্বদেশ এরূপ বক্র যে, বায়ুর কম্পান সকল তদ্দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া কর্ণের নিকট আসিয়া অধিশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শব্দ সকল ঘনীভূত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শ্রবণ যন্ত্রের ন্যায় আবার কথনযন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। দূরস্থিত ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার পক্ষে উহা বিলক্ষণ উপকারী।

কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে কর বাঁকাইয়া ধরিলে এক প্রকার শ্রবণযন্ত্রের কার্য্য হইয়া থাকে। শ্বাপদ জন্তুগণের কর্ণ সম্মুখদিকে কোর করা, এই নিমিত্ত তাহারা সম্মুখ দেশ হইতে আগত শব্দের সুন্দর রূপ আকর্ণন করিতে পারে। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের যে উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতে ঐ রূপ হওয়াই আবশ্যক, পলায়িত পশুগণের সঞ্চার ধ্বনি শ্রবণ করাই তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায়। এ দিকে শশক প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু উহাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদের কর্ণ পশ্চাদ্দিকে কোর করা; এরূপ হওয়াতে তাহারা ধারণকারী জন্তুর সঞ্চার অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করত জীবন রক্ষা করিতে পারে।

প্রতিফলিত শব্দ সমুদায় এক অধিশ্রয়ে সংগ্রহ করিবার যে উপায় আছে, প্রাচীনদিগের মধ্যে তাহা অবিদিত ছিল না। "ডায়নিসিয়সের কর্ণ" নামক সাইরাকিউস নগরের কারাগারে যে যন্ত্রটী ছিল, তাহা অতিশয় কৌতুকাবহ। উক্ত কারাগারের অন্তশ্ছাদের এরূপ গঠন ছিল যে, সামান্য শব্দ করিলেও তাহা ঘনীভূত হইয়া একটী

অধিশ্রয়ে সমবেত এবং একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ দ্বারা দূরে নীত হইত। পাপাত্মা ডায়নিসিয়স সেই সুড়ঙ্গের প্রান্তে বসিয়া বন্দীদিগের সমুদায় পরামর্শ শুনিতেন।

এইক্ষণে কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রতিধ্বনির উল্লেখ করিয়া প্রস্তা-বের উপসংহার করিতেছি। রাইন নদীর তীরস্থ লবলেফেল্‌স্ নামক স্থানে একটী কথার ১৭ বার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে। রোম নগরের মেটেনিতে এক খানি কাব্যের প্রথম পংক্তি ৮ বার প্রতিধ্বনিত হইত। স্কটলণ্ডের হ্রদ ও পর্ব্ব-তের মধ্যে কখন কখন কথার ৪০ বার প্রতিধ্বনি শুনা গিয়াছে। পাটনায় অত্যুচ্চ ও প্রশস্ত মন্দিরাকার একটী গৃহ আছে, উহা গোলঘর বা গোলা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মন্দিরের মধ্যে একটী শব্দ করিলে অনেক বার তাহার প্রতিধ্বনি হয়। এক দিন দুই জন সাহেব ও এক জন বাঙ্গালি ঐ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের সকলেরই বোধ হইল, যেন আর কএক জন লোক উহার মধ্য হইতে গম্ভীরস্বরে কথা কহিতেছে। গৃহটীতে সুন্দর রূপে আলোক আসিতে পায় না, আর সর্ব্বদা বন্ধও থাকে, সুতরাং দুই একটী চামচিকাও তথায় বাসা করিয়াছিল। দর্শকগণ আগমন করিবা মাত্র তাহারাও উড্ডীন হইল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমা-দের বাঙ্গালি ভ্রাতৃগণের মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইবে বিচিত্র কি! তিনি অর্দ্ধেক ভয়ে ও অর্দ্ধেক রহস্যচ্ছলে "গোষ্ট" (ভূত) বলিয়া উঠিলেন। অমনই মন্দিরের অভ্য-ন্তরে গম্ভীর স্বরে "গোষ্ট" "গোষ্ট" "গোষ্ট" "গোষ্ট"

শব্দ হইতে লাগিল। সাহেব দুই জন এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মন্দির মধ্যেও অমনি অট্ট অট্ট হাস্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিংবদন্তী আছে যে, ক্রাশসের পত্নী মেতেল্লার সমধি মন্দিরে একবার ধ্বনি করিলে পাঁচবার ক্রমাগত প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইত। কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ব্রসলস্ নামে রাজধানীর কোন এক প্রাসাদে এক শব্দের ১৫টী প্রতিরব শ্রুতিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন তিনি আর এক আশ্চর্য্য বিবরণ উল্লেখ করেন, যে যৎকালে তিনি মিলান নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক ক্রোশ দূরে একটী পুরাতন প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী এক নদীর ধারে একটী পিস্তল ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহাতে ৫৬ বার প্রতিশব্দ হইয়াছিল। এডিনবর্গ রাজধানীর সন্নিকটে অনেক গুলি প্রতিধ্বনি-জনক স্থান আছে, তাঁহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বিখ্যাত; তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি এক বিশেষ আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনির ব্যাপার বর্ণন করিয়াছেন। ঐ নগরের সন্নিকটস্থ কোন পল্লীতে রণবাদ্য বাজিতেছিল, সেই সময়ে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে অসঙ্খ্য কামানধ্বনির সদৃশ প্রতিধ্বনি হইয়াছিল।

প্রতিধ্বনি নানা প্রকারে শ্রুত হইয়া থাকে। কোন কোনটী সুশ্রাব্য স্বরের ন্যায় শ্রবণমধুর। কোনটী বা দীর্ঘকাল স্থায়ী। প্লিনিনামক প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে অলিম্পিয়ান নগরে শিল্প, সাহিত্য ও কাব্য প্রভৃতি সপ্ত

বিদ্যার সম্মানার্থে যে সাতটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে এক এক শব্দের সাতটী প্রতিধ্বনি হইত। জস্তিন্ নামে স্মৃতিবেত্তা অলিম্পাস্ পর্ব্বতের এক প্রতিধ্বনির বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন; উহা অদ্যাপি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তিনি বলেন, যে আদৌ কতক গুলি শব্দ নিঃসৃত হইয়া যত সম্মুখীন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই বজ্রের শব্দের ন্যায় প্রচণ্ড হইয়া শ্রুতিগোচর হয়।

আর্গাই নামে জেলার এক ঘোষণা-মন্দিরে এরূপ প্রতিধ্বনি হইত যে, তাহার সন্নিকটবর্ত্তী এক উন্নত স্থানের উপর হইতে কথা কহিলে তাহা ঐ মন্দিরের সমাধি স্থানের নিকট মনুষ্যের কথার ন্যায় স্পষ্ট বোধ হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তমাসা অন্তরীপে ও ডেল্‌ফি নামক দ্বীপে এক প্রকার প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ হয়, তাহা অত্যন্ত শ্রবণ-মনোহর। ফিরঙ্গী রাজ্যের তুলবী নামক রাজবাটীতে একটী কৃত্রিম প্রতিধ্বনি আছে, তাহাতে এক কবিতার সমস্ত শব্দ প্রতিপন্ন হয়, এক অক্ষরও লুপ্ত হয় না। তদপেক্ষা আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি শান্তিশিমাত্রিনিদাদ নামক নগরের সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। তথাকার পর্ব্বতমালা মধ্যে এক শব্দ হইলে তাহার শত শতবার প্রতিধ্বনি হয়; এবং পক্ষী সকল আপন গানের প্রতিধ্বনিতে মোহিত হইয়া বারম্বার তাহার উত্তর দেয়। সমুদ্রের কূলে যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহাও শ্রবণ করিলে অত্যন্ত আমোদ জন্মে। অধিকন্তু রাত্রিকালে দূর-শ্রুত নির্ঝর প্রপাতের প্রতিশব্দও অত্যন্ত মনোহর।

প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা এই আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রকৃতির পরিবর্ত্তে অলীক কল্পনার অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, রূপক কল্পনায় তাঁহারা বিশেষ পারগ ছিলেন, এই প্রযুক্ত সকল বিষয়েই রূপক আখ্যায়িকা কল্পনা করিতেন। প্রতিধ্বনি অত্যন্ত রম্য পদার্থ, তাহার সম্বন্ধে রূপক অবশ্যই সম্ভব, এবং পূর্ব্বকালীন গ্রন্থে তাহার অভাব নাই। গ্রীক কবিরা লেখেন যে, প্রতিধ্বনি পবনের কন্যা। সে একদা তাহার প্রিয়সখী জুনের স্বামীর সহিত রসাভাস করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে তাহার প্রতি জুন অসন্তুষ্টা হইয়া তাহার বাক্‌শক্তি রহিত করেন, কিন্তু প্রতিধ্বনি করণের ক্ষমতা তাহার অবশিষ্ট রহিল। সে তদবস্থায় বহুকাল ভ্রমণ করিতে করিতে একদা নারসিস্‌কে অবলোকন করিয়া, তাহাকে উদ্বাহের কথা ব্যক্ত করাতে, সে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে; সেই খেদে প্রতিধ্বনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বর ভূমণ্ডলে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এ প্রকার অপরাপর গল্প অনেক আছে, কিন্তু ঐ সকল গল্প যে প্রকৃত নহে, এবং ইহাতে প্রতিধ্বনির প্রকৃত কারণ নিরূপণ হয় না ইহা বলা বাহুল্য।

আলোক।

রৌদ্রের সময় সহসা বাতায়ন ও দ্বারের কপাট বন্ধ করিয়া দিলে শয্যা, আসন, বসন প্রভৃতি গৃহস্থিত যে সমস্ত বস্তু ইতি পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তৎসমুদায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না, সকলই যেন একবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। দ্বার রোধ দ্বারা, সূর্য্যালোক প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত বস্তুজাত অদৃশ্য হয়, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আলোক কোন না কোন প্রকারে ঐ সকল পদার্থকে দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য করাইয়া দিতেছিল। আলোক কি প্রকারে জড়পিণ্ড সমূহকে দৃষ্টিগোচর করায়, ইহার তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যেমন পৃথিবীর সর্ব্ব স্থান বায়ুতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সেইরূপ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যাবতীয় শূন্যস্থল এক প্রকার স্থিতিস্থাপক পদার্থে পরিপূরিত আছে। এই পদার্থ বায়ু অপেক্ষা অনেক গুণে সূক্ষ্ম। ইহা বায়ুর ন্যায় কম্পিত হয়, কিন্তু তদীয় কম্পন বায়বীয় কম্পন অপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক জবনতা সহকারে ধাবমান হইয়া থাকে। এমন কি, বায়ুর কম্পন সহস্র হস্ত যাইতে না যাইতে, উক্ত পদার্থের কম্পন সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া যায়। এই আশ্চর্য্য পদার্থকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ঈথর নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঈথর আলোকের মূল কারণ। ঈথর না

থাকিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। উহা আছে বলিয়াই সকল পদার্থ উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত হইতেছে। অতএব, বাঙ্গালায় উহার উদ্ভাসন এই নামকরণ হইলে নিতান্ত অসঙ্গতহইবে না। সচরাচর ঈথরকে আকাশ বলিয়া থাকে।

আলোকপ্রসূ উদ্ভাসনের কিছু মাত্র গুরুত্ব নাই। বোধ হয় এই কারণেই ঐ পদার্থের কম্পন এমত অদ্ভুত বেগে স্বাবয়বে সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া থাকে; এবং এই জন্যই স্থূল বস্তুর আঘাতে তাহা বায়ুর ন্যায় বিচলিত বা কম্পিত হয় না। তাহার কম্পন ও বায়বীয় কম্পন তুল্যরূপে অনুভূত হয় না। উহা এত সুকোমল যে অনুভব পটু কর্ণ-ধমনী তদ্দ্বারা বারম্বার আহত হইলেও কিছু মাত্র জানিতে পারা যায় না। কিন্তু জন্তুগণের শরীরে আর একটী এমন ইন্দ্রিয় আছে, যাহা উদ্ভাসনের এই সুকোমল কম্পন সুন্দর রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই ইন্দ্রিয় চক্ষু। চক্ষুর ধমনী গুলি কর্ণধমনী অপেক্ষা সমধিক অনুভবশক্তি-শালিনী। তাহারা উদ্ভাসনের কম্পন অনুভব করিতে পারিবে এই অভিপ্রায়েই নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন বায়ু কম্পিত হইয়া কর্ণধমনী আঘাত করিলে শব্দজ্ঞান হয়, সেইরূপ উদ্ভাসন কম্পমান হইয়া নেত্রধমনী স্পর্শ করিলে আলোক জ্ঞান জন্মে।

জড়পিণ্ড আহত হইলে তৎ সংলগ্ন বায়ু কম্পিত হয়, কিন্তু উদ্ভাসন এরূপ স্থূলোপায় দ্বারা বিচলিত হইবার নহে। অথবা তদ্দ্বারা যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে কম্পিত হয়,

অন্ততঃ তাহা আমাদের অনুভবগোচর হয় না; ইহাকে বিচলিত করিবার অন্য উপায় আছে। দাহ্যমান পদার্থ সকল দগ্ধ হইতে হইতে যখন শিখাকলাপ বিস্তার করে, তখন ঐ শিখাসমূহ দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থিত উদ্ভাসন কম্পমান হইতে আরব্ধ হয়। সূর্য্য নিরন্তর নভোমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিয়া, জাজ্বল্যমান অনশ্বর অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। যদিও দিবাকর বহু দূরে অবস্থিত, তথাপি তাহার প্রচণ্ড তেজঃ প্রভাবে পার্শ্বস্থ উদ্ভাসনে যে কম্পন সঞ্চারিত হয়, সেই কম্পন পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক তত্রত্য জীবগণের দর্শনেন্দ্রিয় আঘাত করে এবং সেই আঘাতে যে আলোকের জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই আমরা সূর্য্যালোক বা রৌদ্র কহিয়া থাকি। সূর্য্য ও জ্বলন্ত পদার্থ সকল উদ্ভাসন কম্পিত করিবার প্রধান কারণ।

উদ্ভাসনের কম্পন প্রসৃত হইতে হইতে কোন জড়পিণ্ডে লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিফলিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে গমন করে। তাহার এই প্রকার প্রত্যাবর্ত্তন কালে, যদি আমাদিগের চক্ষু তৎপথে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহা চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তদ্দ্বারা যে পিণ্ড হইতে ঐ কম্পন প্রতিফলিত হইয়া আইসে, আমরা তাহার আকৃতি অবগত হই। জড়পিণ্ডের প্রত্যেক অংশ হইতে এক এক কম্পন আসিয়া নয়নধমনী আঘাত করে এবং যে কম্পনটী যে অংশ হইতে আইসে, সে কেবল সেই অংশেরই বৃত্তান্ত জানাইয়া দেয়। এই রূপে যে সকল অংশ হইতে কম্পন সমূহ আসিয়া যুগপৎ কনীনিকাতে প্রবেশ করে, আমরা

সেই সমুদায় অংশই একবারে দেখিতে পাই। কোন অন্তরাল না থাকিলে আমরা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। এই বিস্তীর্ণ দৃষ্টিপথের প্রত্যেক্ অংশ হইতে অসংখ্য কম্পন যুগপৎ নয়নধমনী আঘাৎ করিলে, আমাদের তত্রত্য সমুদায় বস্তুর দর্শনজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ, উল্লিখিত প্রকারে জড়পিণ্ডই দৃষ্ট হইয়া থাকে, আলোক দৃষ্ট হয় না। বাতায়ন ও দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া দিলে গৃহের অভ্যন্তরস্থিত বস্তুজাত দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ উদ্ভাসনকম্পন বাতায়নাদি মার্গ দ্বারা স্রোতস্বরূপে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত তত্রস্থ সমুদায় পদার্থের উপর আঘাত করে, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদের নয়ন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তত্তৎ পদার্থের উপলব্ধি করাইয়া দেয়। যেমন একটী কন্দুক বলপূর্ব্বক গৃহকুট্টিমে নিক্ষেপ করিলে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া বারম্বার প্রত্যাবৃত্ত হয়; সেই রূপ উদ্ভাসনকম্পনও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে লাগিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কম্পন ক্রমে এত দুর্ব্বল হইয়া যায়, যে পরিশেষে নেত্রধমনী তাহা আর অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রভাবে উদ্ভাসনে কম্পন সঞ্চারিত হয়, ঐ কম্পন সেই পদার্থেরই কিরণ স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এই জন্য এক কম্পনকেই আমরা সূর্য্যকিরণ, চন্দ্র-কিরণ, দীপ-কিরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিরণ কোন কোন পদার্থকে অল্প

পরিমাণে এবং কোন কোন পদার্থকে অধিক পরিমাণে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কিরণ যে সকল পদার্থ ভেদ করিতে পারে, তাহাদিগকে স্বচ্ছ, আর যে সকল পদার্থ ভেদ করিতে পারে না তাহাদিগকে অস্বচ্ছ কহে। বায়ু জল, কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদর্থ ; কাষ্ঠ, ধাতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থ। সার্সী বন্ধ করিয়া দিলে গৃহ মধ্যে বিলক্ষণ আলোক থাকে, কিন্তু কপাট বন্ধ করিলে আলোক থাকে না অন্ধকার হয়। এক স্থলে কিরণ সার্সীর কাচ ভেদ করিয়া গৃহ মধ্যে আইসে, অপর স্থলে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া আসিতে পারে না। গৃহস্থিত পদার্থ সমূহের উপর কিরণ পতিত ও তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নয়ন মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে তত্তৎ পদার্থের জ্ঞানলাভ হয় না। কাজে কাজেই কেবল অন্ধকার অনুভব হয়। বস্তুতঃ অন্ধকার একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, আলোকের অভাবই অন্ধকার।

কিরণ শূন্যে সরল রেখায় গমন করে। অন্য পদার্থের প্রতিঘাতে অথবা এক পদার্থ ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত ঘন বা সূক্ষ্ম পদার্থান্তরে প্রবেশ করিলে তাহার গতি বক্র হইয়া যায়। কিরণের এইরূপ বক্রগতিকে বক্রীভবন কহে। কিরণ যখন এক পদার্থ ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত ঘনপদার্থ ভেদ করিয়া গমন করে, তখন ঐ ঘনতর পদার্থ প্রবেশমুখে একটী লম্বপাত করিলে কিরণটী বক্র হইয়া লম্ব রেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। কিরণ সকল যখন লম্বভাবে পতিত হয়, তখন তাহারা ঘনপদার্থ ভেদকালীন এরূপ বক্র হয় না। বক্রভাবের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কিরণের তির্-

শ্চীনতারও তারতম্য হইয়া থাকে। যে সূর্য্যকিরণ বক্রভাবে সমসান্দ্র বায়ুরাশি ভেদ করিয়া এক সরল রেখায় আইসে, তাহাও সার্সী স্পর্শ মাত্র বাঁকিয়া অপর এক সরল রেখায় কাচ ভেদ করত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে। এক পদার্থ মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সান্দ্রতা থাকিলে কিরণের গতি সেই সেই স্থলে তিরশ্চীন হয়।

উদ্ভাসনের কম্পন প্রবল রূপে নয়ন ধমনী আঘাত করিলে আলোক প্রখর, আর দুর্ব্বল রূপে আঘাত করিলে আলোক স্নিগ্ধ বোধ হয়। এই রূপ আবার আঘাতের বাহুল্য ও বিরলতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কম্পন দ্বারা নেত্রধমনী অতি বিরলরূপে আহত হইলে লোহিত বর্ণ, আর অতি বহুলরূপে হইলে নীল বর্ণ দৃষ্ট হয়। কম্পন পরিমাণের বৃদ্ধি অনুসারে হরিত, পীত, নারঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ নয়নগোচর হইয়া থাকে। ৪২১০০০০০০০০০০০০ বার চক্ষুর ধমনী আহত হইলে লোহিত বর্ণের জ্ঞান জন্মে, আর ৭৯৯০০০০০০০০০০০০ বার আহত হইলে নীল বর্ণের অনুভব হয়। ইহাতে আপাততঃ বিশ্বাস হয় না, কিন্তু সার আইজাক নিউটন ইহা যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস্য বিবেচনা করিতেন। যে সকল পদার্থ নীল বা লোহিত বর্ণ দেখায়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে উল্লিখিত সংখ্যক কম্পন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নয়নে আঘাত করে, তাহাতেই তাদৃশ দেখায়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের নীলিমা বা লৌহিত্যের কারণান্তর নাই। বর্ণ আলোকের গুণ, পদার্থের গুণ নহে। সচরাচর কহা যায় নীল, পীত ও লোহিত বর্ণ মিশ্রিত

হইলে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ, শ্বেত বর্ণে কোন বর্ণই মিশ্রিত নাই। কম্পনের যত সংখ্যক আঘাতে নীল, যত সংখ্যক আঘাতে পীত ও যত সংখ্যক আঘাতে লোহিত বর্ণ দৃষ্ট হয়, নেত্রধমনী, ঐ সংখ্যাত্রয়ের সমষ্টি যতবার, ততবার কম্পনাঘাত সহ্য করিলে, আমরা শ্বেত বর্ণ দেখিতে পাই।

সূর্য্যালোক শুভ্র, কিন্তু এক সূর্য্যালোক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে কেন? বর্ণ কিছু পদার্থের গুণ নহে। ইহার কারণ অতি আশ্চর্য্য। সকল পদার্থই সর্ব্বপ্রকার কম্পনাঘাত প্রতিফলিত করে না। কোন কোন পদার্থ কম্পনের কোন কোন অংশ আত্মসাৎ করিয়া রাখে এবং অবশিষ্ট অংশ প্রতিফলিত করে। নীলকান্তমণি পীত ও লোহিত বর্ণজনক কম্পনাঘাত আত্মসাৎ করিয়া নীলবর্ণজনক কম্পনাঘাত করে। এই জন্য তাহা নীলবর্ণ দেখায়। পদ্মরাগমণি নীল ও পীত বর্ণজনক কম্পনাঘাত আত্মসাৎ করিয়া লোহিত বর্ণজনক কম্পন প্রতিফলিত করে। এই নিমিত্ত তাহা রক্তবর্ণ দেখায়। যে পদার্থ কেবল নীলবর্ণজনক কম্পন আত্মসাৎ করিয়া লোহিত ও পীত বর্ণ জনক কম্পন প্রতিফলিত করে, তাহা নারঙ্গ বর্ণ দৃষ্ট হয়। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কম্পনের এক এক অংশ আত্মসাৎ করিয়া রাখে। তাহাদের এই মহোপকারিণী শক্তি থাকাতেই প্রকৃতি নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

বর্ণ পদার্থের গুণ নহে, আলোকের গুণ, ইহা অনায়াসে

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। তাহার একটী সামান্য পরীক্ষা এই,—তৈলের পরিবর্ত্তে সুরাসার দ্বারা একটী সেজ জ্বালিয়া তদুপরি একখানি অস্থূল টীনের পাত রাখিতে হইবে। টীনের পাত খানি নিম্নস্থিত দীপশিখা দ্বারা উত্তপ্ত হইলে, তদুপরি কিয়ৎ পরিমিত জলমিশ্র সুরাসার ঢালিয়া দিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই রূপ করিলে কিয়ৎক্ষণ পরেই ঐ মিশ্র পদার্থ সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তদীয় আলোক সর্ব্ব বর্ণ বিরহিত হইবে। যে সকল পদার্থ সূর্য্যালোকে অতি উজ্জ্বল দেখায়, তৎসমুদায়ও ঐ আলোকে অতি বিবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সকল বর্ণের পদার্থই এক প্রকার বোধ হয়। এই পরীক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ মধ্যে করা উচিত এবং ঐ সেজের নিম্নভাগে অর্থাৎ যে অংশ দিয়া টীন পাত্রের নিম্নস্থ দীপের আলোক বহির্গত হয়, ঐ অংশ এক গোলাকার টীনময় নল দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা উচিত।

সাবিত্রী। বঙ্গ দর্শন ৩৭১ পৃ।

১

তমিস্রা রজনী, ব্যাপিল ধরণী, দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বনে একাকিনী, বসিল রমণী, কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ।
আঁধার গগণ ভুবন আঁধার, অন্ধকার গিরি বিকট আকার,
দুর্গম কান্তার ঘোর অন্ধকার, চলেনা ফেরেনা নড়েনা কেহ॥

২

কে শুনেছে হেথা মানবের রব? কেবল গরজে হিংস্রপশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব, কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী, কোলে আরও টানে পতিদেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি, নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তায়॥

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সঙ্কটে, ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে, ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।
সে ছায়া পশিল কাননে,—অমনি, পলায় শ্বাপদ উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি, সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী, মহা গদা প্রভা যেন বা বিজলি,
দেখিলা সাবিত্রী যেন রত্নাবলী, ভাসিল নির্ঝরে আলোকে তার।
মহা গদা দেখি প্রণমিল সতী, জানিলা কৃতান্ত পরলোকপতি,
এ ভীষণ ছায়া তাঁহারই মূরতি, ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার।

৫

গভীর নিস্বনে কহিলা শমন, থর থর করি কাঁপিল গহন,
পর্ব্বত গহ্বরে ধ্বনিল বচন, চমকিল পশু বিবর মাঝে।
"কেন একাকিনী মানবনন্দিনী, শব লয়ে কোলে যাপিছ যামিনী,

ছাড়ি দেহ সবে, তুমিত অধিনী, মমসঙ্গে তব বাদ কি সাজে ?

৬

"এ সংসারে কাল বিরাম বিহীন, নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি দিন,
যাহারে পরশে সে মম অধীন, স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই।
সত্যবানে আসি কাল পরশিল, লতে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধ্বী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল, আপনি লইতে এসেছি তাই"॥

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা, না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নারে পরশিতে সাধ্বী পতিব্রতা, অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের পতি।
তখন কৃতান্ত কহে আরবার, "অনিত্য জানিও এ ছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার, আমার আলয়ে সবার গতি॥

৮

"রত্ন ছত্র শিরে রত্ন ভূষা অঙ্গে, রত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে, আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মহাবীরে, রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞানলোপ করি গরাসি জ্ঞানীরে, সুখ আছে শুধু মম আগারে॥

৯

"অনিত্য সংসার পুণ্যকর সার, কর নিজ কর্ম্ম নিয়ত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার, দিই আমি সবে করম ফল।

যত দিন সতী তব আয়ু আছে, করি পুণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী
পাছে,—
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে, ভুঞ্জিবে অনন্ত মহা মঙ্গল॥

১০

"অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন, অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত
মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্য হয় অনন্ত দর্শন, অনন্ত বাসনা তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতী আছয়ে নাহি বৈধব্যঘটনা, মিলন আছয়ে নাহি
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জনা, রূপ আছে নহে রিপুদুরন্ত।

১১

"রবি তথা আলো করে, না করে দাহন, নিশি স্নিগ্ধকরী
নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন, কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে, নাহিক তরঙ্গ, স্বচ্ছ কল্লো-
লিনীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে, পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক।

১২

"নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন, নাহি তথা ভ্রান্ত বসে
বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপু বশে বৃথায় যতন, নাহি শ্রম লেশ নাহিক
অলস।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, নিদ্রা শরীরে না রয়, নারী তথা প্রাণ-
য়িনী বিলাসিনী নয়,

দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়, দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্
দশ ॥

১৩

"জগতে জগতে দেখে পরমাণু রাশি, মিলিছে ভাঙ্গিছে পুনঃ
ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি, অচিন্ত্য অনন্ত কাল
তরঙ্গে।
দেখে লক্ষ কোটি ভানু অনন্ত গগণে, বেড়ি তাহে কোটি
কোটি ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্ত্তন রব শুনিছে শ্রবণে, মাতিছে চিত্ত সে গীত
তরঙ্গে ॥

১৪

"দেখে কর্ম্ম ক্ষেত্র নর কত দলে দলে, নিয়মের জালে বাঁধা
ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমির মণ্ডলে, নির্দ্দিষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে
নারে।
ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া, জলে যেন জলবিম্ব
যেতেছে মিশিয়া,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলিছে আসিয়া, পুণ্যই সত্য অসত্য
সংসারে ॥

১৫

"তাই বলি কন্যে ছেড়ে দেহ মায়া, ত্যজ বৃথা ক্ষোভ, ত্যজ
পতিকায়া,
ধর্ম্ম আচরণে হও তার জায়া, গিয়া পুণ্যধাম।

গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল, থাক যতদিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিটিবে জঞ্জাল, সিদ্ধ হবে কাম ॥”

১৬

শুনি যমবাণী, জোড় করি পাণি, ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি মুখ খানি।
ডাকিছে সাবিত্রী;—“কোথায় না জানি, কোথায় ওহে কাল।
দেখা দিয়া রাখ এ দাসীর প্রাণ, কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ শঙ্কটে ত্রাণ, মিটাও জঞ্জাল ॥

১৭

“স্বামী পদ যদি সেবে থাকি আমি, কায়মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্যামী, রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যদ্যপি থাকে পুণ্যফল, সতীত্বে যদ্যপি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে দিয়ে পদ স্থল, জুড়াও এ ব্যথা ॥”

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ, আসি প্রবেশিল যে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীত্ব রতন, সাবিত্রী সুন্দরী।
মহাগদা তবে চমকে তিমিরে, শবপদরেণু তুলি লয়ে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে, পতি কোলে করি ॥

১৯

বরষিল পুষ্প অমরের দলে, সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরিরী যুগলে, বিচিত্র বিমানে।

জনমিল তথা দিব্য তরুবর, সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর, সে বিজন স্থানে ॥

মৃগতৃষ্ণা বা মরীচিকা।

মধ্যাহ্নকালে যখন দিবাকর অনবরত প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে থাকে, বিস্তারিত মরুক্ষেত্রে বা প্রান্তরে পথিকগণের কখন কখন সাগর বা প্রশস্ত জলাশয় ভ্রম হয়, ঐ মিথ্যা জল দৃষ্টির নাম মরীচিকা। উষ্ণ প্রদেশে, বিশেষতঃ মরুভূমিতে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্তিকা উষ্ণ হয়, তাহাতে ভূমির গাত্রস্থ বায়ুও উষ্ণ হইয়া লঘু ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। সূর্য্যতাপে বায়ু উষ্ণ হয় না, ভূমি হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তাহাতেই উষ্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং উচ্চতর বায়ু তরল ও নীচের বায়ু ঘন হইয়া থাকে; এইরূপে বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইয়া পড়ে। সূর্য্যের কিরণ যখন বায়ুর লঘু স্তর ভেদ করিয়া ঘনতর স্তরে প্রবেশ করে, তখন তাহা ঠিক সরল রেখায় না আসিয়া তির্য্যক্ ও প্রসারিত হইয়া পড়ে, ইহাতে নিম্নস্থ বায়ুর স্তরকে জল-রাশি বলিয়া ভ্রম হয়। দূরস্থিত বৃক্ষাদি কিরণের পথে পতিত হওয়াতে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতেই উদ্যানের ভ্রম জন্মে। যেমন বায়ু এবং জল এই দুই পদার্থের ভিতর দিয়া দেখিলে যেরূপ দৃষ্টিভ্রম হয়, লঘু ও ঘন বায়ুর মধ্য দিয়া পদার্থ সকল দেখিলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

মরীচিকা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। লম্বমান, তলস্থ এবং শূন্যস্থ।

লম্বমান মরীচিকা। কিরণ উর্দ্ধোধোভাবে তির্য্যক্‌রূপে পাতিত হইলে লম্বমান মরীচিকা উৎপন্ন হয়। এই মরীচিকায় জলাশয়ের মত তট ও তটস্থ পদার্থ সমূহ ও তাহাদিগের উল্‌টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রকার মরীচিকা মিসর দেশে অধিক লক্ষ্য হয়। মহাবীর নেপোলিয়ান্ যৎকালে ঐ দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণ এই রূপ মরীচিকা দেখিয়া অনেক কষ্ট পায়। ইহাতে রৌদ্রপূর্ণ ভূমিকে বোধ হয় যেন তাহা বন্যাতে ভাসিতেছে এবং সেই ভূমির উপরি যে সকল গ্রাম থাকে তাহাকে হ্রদমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় দেখায়। প্রত্যেক গ্রামের নিম্নে তাহার উল্‌টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যেন জলে ছায়া পড়িয়াছে। দর্শক কাছে আসিলে সে বন্যাও থাকে না, সে ছায়াও দেখা যায় না—সম্মুখে কিছু দূরে আবার তদ্রূপ আর একটী মরীচিকা দৃষ্ট হয়। এই প্রকার মরীচিকা পারস্য দেশে " শির অব " আশ্চর্য্য জল বলিয়া প্রসিদ্ধ, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলস্থ বালুকারণ্যে "চিত্র" নামে খ্যাত।

তলস্থ মরীচিকা। কিরণসকল ধরাতলের সমানি হইয়া পড়িলে এই মরীচিকা উৎপন্ন হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর জুরিন্ ও সোরেট নামে দুইজন সাহেব, জেনিবা হ্রদের নিকটে এই রূপ মরীচিকা দেখেন। ১৬,০০০ হাত দূরে এক খানি অর্ণবযান হ্রদের বাম পার্শ্ব দিয়া জেনিবা নগরে আসিতে ছিল, সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, জলের উপরে দক্ষিণতীরের ধারে ধারে অর্ণবযানের প্রতিবিম্ব চলিয়া যাইতেছে। অর্ণবযান উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছিল, কিন্তু

প্রতিবিম্ব পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমগামী বোধ হইল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট বিনস্ সাহেব একটী আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ডোবর উপকূলের দুর্গটী পর্ব্বত পারস্থ রামস্‌গেট নামক স্থানের নিকট বোধ হইল এবং এই প্রতিবিম্বটী এত স্পষ্ট দেখা গেল, যে পর্ব্বত অদৃশ্য হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এতদুভয়ের মধ্যে ইংলিস চানেল নামে এক বৃহৎ প্রণালী প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু মরীচিকা প্রভাবে এই দুই দেশের উপকূল সময়ে সময়ে একত্র সংলগ্ন বোধ হয়। মিসর ও ভারতবর্ষে এই রূপ মরীচিকা দেখা যায়। কর্ণেল টড সাহেব বলেন যে, রাজপুতনা, জয়পুর এবং হিসার প্রভৃতি প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে বোধ হইত যে, ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক যেন উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত এবং মার্ব্বেল পাথরের ন্যায় নানা রঙ্গের ও নানা আকারের অট্টালিকা সকলও দেখা যাইত। ঐ অঞ্চলের ৬। ৭ ক্রোশ দূরস্থিত আগারোয়া নামে এক দুর্গ আছে, হিসারের লোকে তাহাকে হরিশ্চন্দ্র রাজার "দুর্গ" বলে, এই দুর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়া না কি এই রূপ হয়।

শূন্যস্থ মরীচিকা। ইহাতে যে বস্তু যেখানে থাকে, তাহার উপরে শূন্যে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। পোর্টার নামে এক জন সাহেব, বাগদাদ নগরের নিটকস্থ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে টাইগ্রীস নদীর জল অনেক উচ্চে উত্থিত দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকার মরীচিকা প্রায় সমুদ্র বা উপকূলে দেখা যায়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন স্কোর্সবি ১৫ ক্রোশ দূর হইতে পিতার জাহাজ শূন্যে প্রতিবিম্বিত

দেখিতে পান। সিসিলি ও ইটালীর মধ্যস্থ মেসিনা প্রণালীতে একটী আশ্চর্য্য শূন্যস্থ মরীচিকা দেখা যায়, ইহাকে "ফাতামর্গানা" কহে। মানুষ, সৈন্যশ্রেণী, উদ্যান, শকট ও অশ্ব প্রভৃতির প্রতিবিম্ব কখন তীরে, কখন জলে, কখন শূন্যে এবং কখন জলরাশির উপরে অস্পষ্ট দেখা যায়। কুজ্ঝটিকা হইলে তাহা অতি স্পষ্ট হয়। অনেক সময় একটী বস্তুর দুই প্রতিবিম্ব হয়, একটী সোজা ও অপরটী উল্‌টা। এক এক পদার্থের প্রতিবিম্ব কখন ভয়ঙ্কর বৃহৎ দেখায়।

নিম্নে কয়েকটী আশ্চর্য্য মরীচিকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ফ্রাস দেশীয় মঙ্গ নামা এক জন সাহেব, মিসরের সন্নিকটে একবার মরীচিকা সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সমস্ত মরুক্ষেত্রকে তাঁহার জলাশয় বোধ হইয়াছিল, এবং তৎপার্শ্ব ও মধ্যবর্ত্তী গ্রাম ও নগর সকলকে তিনি সাগরবেষ্টিত ও সাগরস্থিত দ্বীপবৎ অবলোকন করিয়াছিলেন। ক্লার্ক সাহেব কহিয়াছেন যে, তাঁহার পরিব্রজন কালে, তিনি একদা আরবের মরুভূমিতে এক মরীচিকা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া একগ্রামে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, তিনি ক্রমে ক্রমে এক প্রশস্ত নদীতীরে উপনীত হইতেছেন এবং ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পর পারে যাইতে হইবেক। ঐ মরীচিকায় তাঁহার এমন গাঢ় ভ্রম হইয়াছিল, যে তিনি উহাকে যথার্থ জলবোধ করিয়া আপন নেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা কি উপায় দ্বারা এই সম্মুখস্থ নদী পার

হইব। তাঁহার নেতা, এই কথা শ্রবণ করিয়া, হাস্য করিয়া কহিল, উহা নদী নহে, বালুকা ভূমি, আমরা উহা উষ্ট্র-পৃষ্ঠেই অবিলম্বে উত্তীর্ণ হইব, কিন্তু সাহেবের একথা পরিহাস বোধ হইল। পরে যখন তাঁহার নেতা তাঁহাকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিতে কহিল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহারা যে স্থান উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়ছেন, তাহাও ঐ প্রকার নদীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; তখন তিনি এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

যাহারা প্রশস্ত প্রশস্ত মরুভূমিতে মরীচিকা অবলোকন করিয়াছে,তাহারা কহিয়াছে যে,সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের সহিত মরীচিকার কিছু মাত্র ভিন্নতা বোধ হয় না। এরূপ জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে, নিদাঘ কালে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগকুলও মরীচিকায় জলভ্রম করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। মৃগগণ পিপাসায় কাতর হইয়া যত মরীচিকার প্রতি ধাবমান হয়, ততই ঐ মিথ্যা জলাশয় তাহাদিগের নিকট হইতে অন্তরিত হইতে থাকে এবং তাহারা ক্রমাগত ঊর্দ্ধশ্বাসে ঐ মরীচিকাভিমুখে গমন করিয়া উত্তরোত্তর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

জগতের মধ্যে যে সমস্ত অতি আশ্চর্য্য মরীচিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ইটালী দেশস্থ “ফাতা মর্গানা” নামক আতপ-প্রতিবিম্ব কোন মতে কনিষ্ঠ ব্যাপার নহে। তাদৃশ অদ্ভুত মরীচিকা ভূমণ্ডলের আর কোন অংশে দৃষ্টিগোচর হয় নাই; ইটালী দেশের কেবল দক্ষিণ ভাগে এই অদ্ভুত দর্শন দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ব্যাপার বহুকালাবধি ইটালী ও শিসিলী দ্বীপস্থ লোকদিগের সুগোচর আছে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যার প্রকৃষ্ট আলোচনা না থাকাতে, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাহারা উহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণ পূর্ব্বক কোন প্রমাণ্য কারণের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারে নাই। অধিকন্তু প্রাচীন কালে উল্লিখিত প্রতিবিম্বের যে কাল্পনিক কারণ গুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ইদানী তাহা পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রাইডন নামে এক জন ভ্রমণকারী অনুমান করেন যে, মেরুদ্বয় নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ "আরোয়া বোরিয়েলিস" বা স্থির-সৌদামিনী নামক নৈসর্গিকব্যাপারের ন্যায় ইহা দীপ্তির ধর্ম্মবিশেষে উৎপন্ন হয়। যে স্থানে ঐ অদ্ভুত প্রতি-বিম্ব পরিদৃশ্যমান হয়, তথায় বহুতর আগ্নের কূপ আছে। ঐ আগ্নের কূপ হইতে প্রকৃষ্ট রূপে বিদ্যুৎ পদার্থ উদ্ভাবিত হয়, এবং বায়ুর সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া অধঃস্থ বাতাবর্ত্তন দ্বারা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্যন্ত আন্দোলিত হইলে, সূর্য্যকিরণসহযোগে প্রস্তাবিত প্রতিবিম্ব নয়ন-গোচর হয়। পরন্তু এই ব্যাখ্যা সুনিশ্চিত রূপে সাব্যস্থ হয় নাই। উক্ত প্রাচীন অনুমানের অন্যার্থবাদী মাজ্জি-আঞ্জিলুসি ও অন্যান্য তদ্দেশীয় লেখকদিগের মতে ঐ অনুমান কিয়দংশে প্রামাণ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। তন্নি-মিত্ত, তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিলিস নামক পণ্ডিত দ্বারা এতদ্বিষয়ের যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

উল্লিখিত মহানুভাব লিখিয়াছেন যে, বারত্রয় এই আশ্চর্য্য ছায়াবিম্ব তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। উহা প্রায় সচরাচর অরুণোদয়কালে নয়নগোচর হয়। উক্ত সময়ে সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত তির্য্যক্‌ভাবে সলিলের উপরিভাগে নিপতিত হয়। তৎসময়ে যদি সমুদ্রের উপরিভাগ নিস্তব্ধ ভাবে স্থিত হয়, বায়ুর আঘাতে কিছু মাত্র আন্দোলিত না হয়, তাহা হইলে দর্শক সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, জলের উপর ছায়াবাজীর দৃশ্যের ন্যায় অকস্মাৎ চতুষ্কোণ, অর্দ্ধ স্তম্ভ, খিলান-বিশিষ্ট বৃহৎ দুর্গ, গোলস্তম্ভ, দুর্গের উন্নত চূড়া, অপূর্ব্ব শোভান্বিত গবাক্ষ ও বারাণ্ডাযুক্ত রম্যভবন, তথা পাদপশ্রেণী, পশ্বাদি বিচরণীয় গোষ্ঠ, এই সমস্ত পদার্থের ছায়া উপর্য্যুপরি অতি বৃহৎ পরিমাণে দৃষ্টিপথে পরিচালিত হইতে থাকে, তাহার সংখ্যা এত অধিক যে, তাহার গণনা করা ভার হয়। তন্মধ্যে কোন পদার্থ গতি যুক্ত, কোনটা বা স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির ভাবে অবস্থিত বোধ হয়। ঐ সমস্ত ছায়াপদার্থে স্ব স্ব বর্ণেরও কোন বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয় না। অপর, উক্ত সময়ে শূন্যোপরি বাষ্পের অতিশয় প্রাচুর্য্য থাকিলে এবং বায়ু দ্বারা কোন ক্রমে ঐ বাষ্পরাশির গাঢ়তা বিচ্ছিন্ন না হইলে ঐ রূপ প্রতিবিম্ব অন্তরীক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু তদবস্থায় প্রতিবিম্বিত পদার্থ সকল আকাশবর্ত্তী ধূমকেতুর ন্যায় অল্প দীপ্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়—কোন বর্ণের আর ভেদ থাকে না। পক্ষান্তরে বায়ু অতিরিক্ত বাষ্প দ্বারা অতিশয় গাঢ় ও দৃষ্টিরোধক হইলে, ঐ সকল পদার্থ অল্প

মাত্র লোহিত, শ্যামল, পিঙ্গল ইত্যাদি বর্ণে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহা হইলে শূন্যে প্রতীয়মান না হইয়া সমুদ্রজলোপরি দৃষ্ট হয়। এই নৈসর্গিক ছায়বাজী বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না; পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সূর্য্যকিরণ যাবৎ অত্যন্ত তির্য্যক থাকে; তাবৎ উহা নয়নগোচর হয়, তৎপরে তাহা দেখিতে দেখিতে মেঘে মিলিত হয়।

এই আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব প্রায় সর্ব্ব ঋতুতে কোন কোন সময়ে দৃষ্ট হয়, এবং যৎকালে ঐ আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব অবলোকিত হয়, তৎকালে জনপদবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণ জনগণ মহোল্লাসে দীর্ঘ জনরব করিতে করিতে মেসিনা প্রণালীর উপকূলাভিমুখে ধাবিত হয়, ও করতালি প্রদান পূর্ব্বক "মর্গানা, মর্গানা, মর্গানা," এই বাক্যটী অনবরত উচ্চারণ করে। ঐ সময়ে সমুদ্রকূলে এতাদৃশ জনতা ও মহোল্লাস প্রকাশিত হয় যে, কোন বিশেষ পর্ব্বাহে তাদৃশ জনতা হয় না।

বিজ্ঞবর মিনাসি সাহেব অনুমান করেন যে, যে সকল লঘু পরমাণু বায়ুসহকারে শূন্যে পরিচালিত হয়, তাহা দর্পণবৎ কার্য্য করে, এবং উপকূলে যে যে পদার্থ আছে তত্তাবতের প্রতিবিম্ব তাহাতে নানাবিধ বর্ণে প্রতীত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়গোচর হয়। অপর, যথা এক বস্তু বহু দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়, তথা ঐ দর্পণবৎ পরমাণুরাশির বিভিন্ন পিণ্ড ব্যাপ্ত থাকিলে উপকূলের এক দ্রব্য বহু সংখ্যায় প্রতীত হয়। অধিকন্তু, সামান্য দর্পণের শমস্থূলতাদি অবয়বের ব্যাঘাত হইলে যে রূপ প্রতিবিম্বিত

বস্তুর অবয়বের বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়া থাকে, পরমাণুরাশির অবয়ব ভেদে সেই রূপ প্রস্তাবিত আতপ প্রতিবিম্বে উপকূলের পদার্থের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। উহার অন্যবিধ কারণ নাই।

চিন্তা।

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
জুড়াতে দিবসশ্রম বিস্মৃতি সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃ সম্ভূত অনিলে,
কার্য্য ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

রজনীর প্রতিক্ষায় প্রকৃতি কামিনী,
ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিত কায়,
উজলিয়া গগণের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।

রঞ্জিত আকাশ তলে, নীল তরঙ্গিণী,
দেখাইচে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে,
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোল মালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গ নিচয়,
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ,
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল শিশু মধুর গায়ন,
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

নাহি জানে অভাগার অবস্থা কেমন,
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষণ্ণ অন্তরে,
কে বা রাজা, প্রজা কেবা, নাহি জানে রাজসেবা,
নাহি জানে অধীনতা কেমন নিগড়,
স্বাধীনতা কি রতন, ভাবে না কখন।

শিশুমতি এ সকল নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি ভাবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল,
বিধবা কুটুম্ব যারা, তাহাদের অশ্রুধারা,
নিরখিয়া কাঁদে বাছা প্রণয় বৎসল,
কিন্তু কিসে যায় দুঃখ চিন্তে না বিধান।

অই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল হৃদয়,
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায়,
লতা পাতা জড় করি, কভু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায়রে! শৈশব কাল সুখের সময়।

চিন্তা কালভুজঙ্গিনী করে নি দংশন,
নিরাশ প্রণয় দুঃখে দহে নি জীবন,
দুরাকাঙ্ক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে, আহা! জানে কি এখন,
মানব জনম তার, দাসত্ব জীবন।

হাস হাস হাস শিশু, নহে দিন দূর,
সংসার সাগর পারে বসিয়ে যখন,
বিষাদ তরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ, জানিবে তখন,
নির্ম্মল শৈশব ক্রীড়া সুখের স্বপন।

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্ম্মল,
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন কলি, দিতে সুখে জলাঞ্জলি,
কে ফুটালে, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে?
কে মম সুখসাগরে মিসালে গরল?

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক শক্তি হলো বিকশিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন।

না জানি কি মন্ত্রে বিদ্যা করিল দীক্ষিত,
যত পড়ি তত বাড়ে মনেতে বিষাদ,
ততই অসুখ মনে, দহিতেছে প্রতিক্ষণে,
কেন পড়িলাম আহা, একি পরমাদ,
ভাগ্য গুণে সকলি কি ঘটে বিপরীত।

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর,
কেন দেখিলাম, আমি কেন পাইলাম,
আপনার পরিচয়, আর্য্য বংশ কীর্ত্তিচয়,
কেন পড়িলাম, আহা কেন জন্মিলাম,
এ হেন বংশেতে আমি অধম পামর।

বল মা ভারত ভূমি বল না আমায়,
কোথায় তোমার সেই বীর পুত্রগণ?
যাঁহাদের বীর্য্যবলে, তব নাম ধরাতলে,
পূজ্যতম ছিল যেন অমর ভবন,
সে সকল পুত্রতব বল না কোথায়?

অগ্নি।

যে সমস্ত ক্ষমতা থাকাতে মানুষ অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, অগ্নি উৎপাদনের শক্তি তন্মধ্যে একটী প্রধান ক্ষমতা ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই অগ্নি আবশ্যক; অগ্নি না থাকিলে আমাদের কি দশা ঘটিত তাহা অনুভব করা কঠিন।

ফলতঃ, যদি আমরা ইচ্ছামত অগ্নি উৎপাদন করিতে না পারিতাম, তবে আমাদের অবস্থা ইতর জন্তু অপেক্ষা বড় উৎকৃষ্ট হইত না।

অগ্নির প্রশংসা করিয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করা কোন ক্রমেই কঠিন ব্যাপার নহে। অগ্নি না থাকিলে কোথায় বা বাষ্পযান থাকিত, কি রূপেই বা শিল্প কার্য্যের সমুত্থান হইত, কোথায় বা তমোনাশিনী দীপমালা বিরাজ করিত, আর কি রূপেই বা উপাদেয় আহারসামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারিত। অগ্নি আমাদের যেমন মিত্র, পক্ষান্তরে উহা আবার আমাদের তেমনি ভীষণ শত্রু। অগ্নির প্রসাদে আমরা সর্ব্বক্ষণ অশেষবিধ মঙ্গল লাভ করিয়া থাকি, এবং তাহার কোপাবেশ হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে হতসর্ব্বস্ব হইয়া যাই। ঈদৃশ মহৎ পদার্থের জ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনুক্ষণ আমরা উহার কার্য্য দেখিতেছি, কিন্তু উহার তত্ত্বচিন্তনে একক্ষণও নিয়োজিত করি না।

অগ্নির স্বরূপ কি? উহার দাহিকা শক্তি থাকিবার কারণ কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। "কেন হয়" এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা মানববুদ্ধির অসাধ্য; "কি হয়" কেবল এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানই বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত। অগ্নির প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ে সকলেই সমান অজ্ঞ; সুতরাং দহন কার্য্য কাহাকে বলে আমরা কেবল সেই বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কোন দুই পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণ হইলে তাপ ও

আলোকের বিকাশ হয়(১); যখন বলবৎ রূপে ঐ মিশ্রণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখনই সমধিক তাপ ও আলোকের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং ঐ বিকাশকেই আমরা অগ্নি বলিয়া থাকি।

অম্লজান ও অঙ্গারের যদি রাসায়নিক মিশ্রণ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নির উৎপত্তি হয়। দুই পদার্থ মিশ্রিত হইলে যে তাপের বিকাশ হয়, পাঠকগণের মধ্যে অনেকে তাহা দেখিয়াও থাকিবেন,—চূণে জল ঢালিয়া দিলে বিলক্ষণ তাপের বিকাশ হয়, এমন কি ঐ মিশ্রণ সময়ে তন্মধ্যে তালপত্র ধরিলে উহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। এই কারণে চূণের ভাটিতে অনেকের হস্ত পদাদি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

কোন দুই পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইলেই তাপ ও আলোকের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু আমরা সচরাচর যে অগ্নি দেখিয়া থাকি, তাহা কেবল অম্লজান বাষ্পের (গ্যাসের) সহিত অন্য কোন পদার্থের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে*। কাষ্ঠ, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যে জ্বলনশীল পদার্থ আছে, ঐ পদার্থ বায়ুর অন্তর্গত অম্লজানের সহিত সংমি-

(১) কখন কখন তাপের বিকাশ না হইয়া বরঞ্চ হ্রাস হইয়া থাকে।

* পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, অম্লজান ও যবক্ষারজান সংযোগে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চম অংশ অম্লজান। হরিতক, পুতিক, অরুণক ইত্যাদি পদার্থ অন্যান্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইলেও অগ্নির উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে।

লিত হয় এবং ঐ সংমিলন কার্য্যের সময় অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আপাততঃ এমন মনে হইতে পারে যে, যদি কাষ্ঠের অন্তর্গত পদার্থের সহিত বায়ুর অন্তর্গত অম্লজানের সংযোগ হইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, তবে সর্ব্বদাই ত অগ্নির উৎপত্তি হইতে পারিত, বায়ুরও অপ্রতুল নাই, কাষ্ঠ প্রভৃতিও সর্ব্বদাই বায়ু সমুদ্রে অবস্থিত রহিয়াছে, তবে কেন সর্ব্বদাই সমস্ত পদার্থই জ্বলিতে থাকে না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, রাসায়নিক সংযোগ হইবার পূর্ব্বে, পদার্থ মাত্রেরই যথোপযুক্ত তাপবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক; যখন কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য উপযুক্তরূপ তাপবিশিষ্ট হয়, তখনই তাহারা বায়ুর অন্তর্গত অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। উপযুক্ত তাপবিশিষ্ট করিবার নিমিত্তেই আমরা কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যের নিকট অগ্নি লইয়া যাই, ঐ অগ্নির তাপে কাষ্ঠ যখন উত্তপ্ত হয়, তখনই বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত কাষ্ঠের অন্তর্গত জ্বলনশীল পদার্থের সংযোগ আরম্ভ হয়, অর্থাৎ কাষ্ঠ জ্বলিতে আরম্ভ করে।

টিকা ধরাইবার সময় আমরা অগ্নিস্পর্শ দ্বারা তাহার এক পার্শ্ব উত্তপ্ত করি। অগ্নির তাপে যখন সেই পার্শ্ব উপযুক্তরূপ উত্তপ্ত হয়, তখন অম্লজানের সহিত উহার সংযোগ আরম্ভ হয়। সংযোগ কার্য্য আরম্ভ হইবা মাত্র যদি আমরা নিয়োজিত অগ্নি স্থানান্তরিত করি, তাহা হইলে দহন ক্রিয়া বন্ধ হয় না; কারণ টিকার অন্তর্গত পদার্থের সহিত অম্লজানের একবার সংযোগক্রিয়া আরম্ভ হইবা মাত্র তাহাতে

নূতন তাপেরও বিকাশ হইয়া থাকে। সেই তাপ দ্বারা নিকটস্থ পরমাণুগুলি বিলক্ষণ উৎপ্ত হয়; সুতরাং অম্লজানের সহিত তাহাদের রাসায়নিক যোগ হইবার কোন বাধা থাকে না। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্য একবার প্রজ্জ্বলিত করিলে, যতক্ষণ জ্বলনশীল পদার্থ তদন্তর্গত থাকে, ততক্ষণ দহনক্রিয়াও চলিয়া থাকে।

দীপ, বর্ত্তিকা প্রভৃতিও ঐ রূপে জ্বলিয়া থাকে। অগ্নি সংযোজনায় দশাটী বিলক্ষণ উত্তপ্ত হয়। দশার অন্তর্গত পদার্থ ও দশাসংলগ্ন তৈল অথবা বসা অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ রাসায়নিক সংযোজনাজনিত তাপে দশাসংলগ্নতৈল বা বসাবিন্দু সমূহ দ্রবীভূত হইয়া কৈশিক আকর্ষণ দ্বারা উহার অগ্রভাগে নীত ও পরিশেষে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান হয়। এই ঊর্দ্ধগামী বাষ্পাকার পদার্থ অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হয়, সুতরাং আলোক ও তাপের সঞ্চার হয়।

কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়। ঘৃষ্ট পরমাণু সকল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, সুতরাং অম্লজানের সহিত সংযোজ্য হইয়া উঠে।

চকমকি ঠুকিবার সময় কঠিন ইস্পাতের বলবৎ আঘাতে প্রস্তরাণুসকল অত্যন্ত সংকুচিত ও সুতরাং এরূপ উত্তপ্ত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তাহা অম্লজানের সহিত সংমিলিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে।

মৃতদেহ কিয়দ্দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিলে, তাহা ক্রমে পচিয়া উঠে ও পরে অল্প অল্প করিয়া নাশপ্রাপ্ত হয়

বাস্তবিক দেহের পরমাণু সকল নাশপ্রাপ্ত হয় এমন নহে; ঐ সমস্ত পরমাণু জীবিতাবস্থায় সমষ্টিভাবে থাকে, জীবনান্তে উহাদের ব্যষ্টি হয়। যে পরমাণুর যাহার সহিত রাসায়নিক আকর্ষণ অধিক, সেই পরমাণু সেই পদার্থের সহিত সংমিলিত হইয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করিতে থাকে। এইরূপে আপাততঃ দৃশ্যমান ক্ষয়শীল মৃতদেহ বাস্তবিক বিনষ্ট হয় না, উহার পরমাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন মৃত দেহস্থ পরমাণুর রাসায়নিক বিয়োগ হইতেছে, তেমনই আবার রাসায়নিক সংযোগও হইতেছে, ফলতঃ যেখানে বিয়োগ আছে, সেই খানেই সংযোগ আছে। এই সংযোগ ক্রিয়ায় মৃতদেহে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তাপের অল্পতা হেতু অগ্নির উৎপত্তি হয় না।

এইক্ষণে পাঠকবর্গ এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন, বস্তুদ্বয়ের রাসায়নিক সংমিলন হইলেই তাপের সঞ্চার ও ঐ তাপের আধিক্য হইলেই অগ্নি ও অগ্নিশিখা দর্শনগোচর হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য নহে, সুতরাং রাসায়নিক সংমিলন হইলেই তাপের সঞ্চার হইবার কারণ কি ইহা চিরকালই অপরিজ্ঞেয় থাকিবে, তবে এক জন রসায়নবিৎ পণ্ডিত এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখা উচিত।

তিনি বলেন উদ্ভিদ্ মাত্রই জল, বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে শরীর বর্দ্ধনোপযোগী পরমাণু সমূহ আকর্ষণ করিয়া লয়; ঐ সমস্ত পরাণু বৃক্ষলতাদির শিরা দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তাহাদের শরীর মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হয় এবং ঐ সমস্ত পরমাণুর সংযোগেই শারীর পদার্থ হয়। প্রায় শারীর পদার্থ হইতেই অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কাষ্ঠ, তৈল, বসা সমস্তই শারীর পদার্থ। উদ্ভিদ্গণের বর্দ্ধন অর্থাৎ শারীর পদার্থের উৎপত্তি কেবল দিবাভাগেই হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণেই উদ্ভিদ্গণের সমধিক বৃদ্ধি হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সূর্য্যকিরণ শারীর পদার্থ উৎপাদনের একটী প্রধান সাধন। এমন কি, ইহা স্বীকার করিলেও নিতান্ত অন্যায় হয় না যে, জলীয়, বায়বীয় ও পার্থিব পরমাণু যেমন বৃক্ষশরীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে, সূর্য্যকিরণও তেমনই ঐ সকল পরমাণুর ন্যায় শারীর পদার্থ মধ্যে প্রোথিত থাকে। যখন শারীর পরমাণুর ধ্বংস হয়, অর্থাৎ উহাদের রাসায়নিক সংযোগের বিয়োগ হয়, তখন তৎসংশ্লিষ্ট কিরণাণুরও বিয়োগ হইতে দেখা যায়। এই কিরণাণুর বিয়োগই তাপের বিকাশ।

উল্লিখিত রসায়নবিৎ পণ্ডিতের মতে অনুমোদন করিলে, বস্তুতঃ ইহাই স্বীকার করা হয় যে, তাপ ও অগ্নির আদি কারণ সূর্য্য।

আমরা এতক্ষণ কাষ্ঠের অন্তর্গত জ্বলনশীল পদার্থের নাম উল্লেখ করি নাই, এক্ষণে সেই জ্বলনশীল পদার্থগুলি কি কি, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

কাষ্ঠ, তৈল প্রভৃতি দহনশীল দ্রব্য মাত্রেরই প্রধান অঙ্গ দুইটী—অম্লজান এবং অঙ্গার।

বিশুদ্ধ কয়লাকে রসায়নবিৎ মহাশয়েরা অঙ্গার (কার্বন) বলিয়া থাকেন। আমরা সচরাচর যে কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকে; বিশুদ্ধ কয়লার লক্ষণ এই যে, দহন করিলে উহার ভস্মাবশেষ থাকে না। সজিনা গাছের কয়লা প্রায় বিশুদ্ধ অঙ্গার। হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গার, উহাকে দগ্ধ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অঙ্গার রূঢ় পদার্থ।

দহন কার্য্যের সময়, যে অঙ্গার অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতনবিধ যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে ও আপাতত দগ্ধবত ধ্বংস হইতেছে বলিয়া যে বোধ হয়, বস্তুতঃ যে তাহা হয় না, এই বিষয়ের দুই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া অতি সহজ।

একটী কাচময় পাত্র ১৬ রতি পরিমাণ অম্লজান দ্বারা পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ছয় রতি পরিমাণ একখণ্ড বিশুদ্ধ অঙ্গার রাখিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিতে হয়; পরে সূর্য্যকান্ত দ্বারা ঐ অঙ্গারখণ্ডে সূর্য্যকিরণ পতিত করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ অঙ্গারখণ্ড ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। অগ্নি নির্ব্বাপিত ও পাত্রস্থ বাষ্প শীতল হইলে ওজন করিলে জানা যাইবে যে, ঐ বাষ্প ১৬ রতি নাই, ২২ রতি হইয়াছে। ইহাতেই সপ্রমাণ হইবে যে, ৬ রতি অঙ্গারের ধ্বংস হয় নাই কেবল অবয়বান্তর মাত্র হইয়াছে। আবার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, অঙ্গারসংমিলিত বাষ্প (গ্যাস) নূতনবিধ

গুণোপেত হইয়াছে, অম্লজানের কোন গুণই আর উহাতে বিদ্যমান নাই। পরন্তু যদি অম্লজানের পরিবর্ত্তে অন্য কোন বাষ্প দ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করা হইত, তাহা হইলে কোন মতে দহনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত না।

অব্‌জানও একটী রূঢ় পদার্থ। উহা অঙ্গারের ন্যায় কঠিন নহে। উহা অদৃশ্য বাষ্পভাবাপন্ন। অব্‌জান অপেক্ষা কোন পদার্থই লঘু নাই। ব্যোমযান ঐ বাষ্পে পূর্ণ থাকে। এক ভাগ অব্‌জান এবং আটগুণ ভারী অম্লজান সংযুক্ত করিলেই জলের উৎপত্তি হয়। অম্লজান প্রজ্জ্বলিত করিলে ঈষৎ পীতবর্ণ শীখা দৃষ্ট হয়, উহার আলোক মন্দ, কিন্তু তাপ অতি তীব্র হয়। অঙ্গার প্রজ্জ্বলিত করিলে শিখা হয় না, কেবল লোহিত বর্ণ হয় এবং অম্লজানের সহিত সংমিলিত হইয়া অদৃশ্য বাষ্প ভাবে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু অব্‌জান জ্বলিবার সময় এরূপ তীব্র তাপের বিকাশ হয় যে, তদ্দ্বারা ঐ যৌগিক বাষ্প জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। অধিক তাপ পাইলে যেমন লৌহ লোহিত বা শুভ্র হয়, অব্‌জানোদ্‌ভূত তাপ দ্বারা তেমনই ঐ যৌগিক বাষ্প দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে। বাষ্পের এইরূপ প্রদীপ্ত অবস্থাকেই আমরা শিখা বলিয়া থাকি।

এক্ষণে স্থির হইল যে, দহনশীল পদার্থ মাত্রেরই প্রধান অঙ্গ দুইটী, অঙ্গার ও অব্জান। অঙ্গারের সহিত অম্লজানের যোগ হইলে আঙ্গারিক অম্ল হয়, এবং অব্‌জানের সহিত অম্লজানের যোগ হইলে জলের উৎপত্তি হয়, সুতরাং কাষ্ঠাদি দাহন করিলে আঙ্গারিক অম্ল ও জলীয় বাষ্পের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা নির্ণয় করা অতি সহজ।

কাঁচা কাষ্ঠে জলীয় পরমাণু থাকে। ঐ জলীয় পরমাণু বাষ্পাকারে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিলক্ষণ তাপের আবশ্যকতা হয়, এই নিমিত্ত জ্বালানি কাষ্ঠ শুষ্ক রাখা আবশ্যক।

কাষ্ঠাদি দাহন করিবার সময় ধূম হইয়া থাকে। কাষ্ঠস্থ অঙ্গারের যে সকল পরমাণু উত্তম রূপে অম্লজানের সহিত সংমিলিত না হয়, সেই সকল পরমাণুই ঝুলের আকারে পরিণত হয়। বায়ুর অল্পতাই ঝুল হইবার এক কারণ। এই নিমিত্ত ইংলণ্ডে অগ্নি মধ্যে যাহাতে প্রচুর রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমাদের প্রদীপে অনেক তৈল অনর্থক নষ্ট হয়। আর্গাণ্ড ল্যাম্পে সুচারুরূপে বায়ু সঞ্চালিত হওয়াতে বৃথা তৈল নষ্ট হইতে পায় না।

অগ্নিতে ফু দিলে কি নিমিত্ত উহার তেজ বৃদ্ধি হয়, বোধ করি এক্ষণে পাঠকবর্গ তাহার মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন।

সায়ংকাল।

চেয়ে দেখ চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ বিন্দু রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিছে তা সবারে সুনীল আঁচলে।

কেনা জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী,
সিক্ত ধরা পরি ধনী দৈব মায়া বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি।
কনক কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে,
সাজাইবে গজবাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহিবে অম্বরে।
নদ-কুলে উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে,
সুবর্ণের গাছ রোপি থোবে লো উপরে!
স্বর্ণ অঙ্গ বিহঙ্গম এবাজী করারে,
শুভক্ষণে দিনকর করদান করে। চতুর্দ্দশ পদীকবিতা

শক্রধনু।

কখন কখন নভোমণ্ডলে নানা বর্ণ বিরাজিত পরম সুন্দর ধনুর আকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় অনেকে উহাকে ইন্দ্রদেবের ধনু অথবা রামের ধনু বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক উহা কোন ব্যক্তির ধনু নহে। ইদানীন্তন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, ঐ ধনুর সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, এই অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যখন সূর্য্যের সম্মুখ দিকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হয়, তখন ঐ বৃষ্টিবিন্দু সমূহে সূর্য্যরশ্মি পতিত ঐ রূপ নানা বর্ণের পরমসুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং কোন ব্যক্তি সূর্য্য ও বৃষ্টির মধ্যস্থানে সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলে ঐরূপ ধনু দেখিতে

পায়। সূর্য্যের রশ্মিপাত দ্বারা যে আকারের উৎপত্তি হয়, তাহার কিয়দংশ দিগ্বলয়ের অধোভাগে অদৃষ্ট থাকে, অবশিষ্ট ভাগ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, এজন্য তাহাকে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন দেখায়। দর্শক যত উচ্চ স্থানে থাকিয়া শক্রধনু দর্শন করে, ততই সে তাহাকে মণ্ড-লাকার দেখিতে পায়। যখন কোন জল প্রপাতাদিতে সৌর কিরণ পতিত হইয়া ধনুর উৎপত্তি হয়, তখন কোন দর্শক পর্ব্বতাদির উচ্চ শিখর হইতে তাহা দর্শন করিলে, সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার দেখিতে পায়। অবস্থিতির স্থানের উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে প্রত্যেক দর্শকেরই ভিন্ন ভিন্ন আকারের ধনু দেখিবার সম্ভাবনা।

যখন সূর্য্য ও তাহার সম্মুখস্থ বৃষ্টিধারা সমসূত্র ভাবে অবস্থিতি করে, প্রায় তখনি শক্রধনু দৃষ্ট হয়। এই হেতু বশতঃ প্রাতঃকালে পশ্চিমদিকে ও বৈকালে পূর্ব্বদিকে শক্রধনু উদয় হয়। কোন কোন সময়ে আকাশপথে উপর্য্য-ধোভাবে দুইটী শক্রধনু দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধঃস্থ ধনুটীর বর্ণ যেমন গাঢ় ও উজ্জ্বল দেখায়, উপরিস্থ ধনুর তাদৃশ দেখায় না। নিম্নের অপেক্ষা উপরের ধনু অন-তিস্ফুট ও প্রভাহীন লক্ষিত হইয়া থাকে। বৃষ্টিকালীন জলবিন্দু সমূহে সৌররশ্মিপাতের ইতর বিশেষ ঘটনাই ইহার প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাত কালে সমুদায় বারিবিন্দু গুলি সূর্য্যও দর্শকের সমসূত্রে থাকে না, কতকগুলি সমসূত্রের উপর থাকে, কতক গুলি নিম্নে থাকে এবং কতক গুলি সম-সূত্রে থাকে, সুতরাং ঐ সমুদায় বারিবিন্দুতে সূর্য্য কিরণ

এক ভাবে পতিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। যে বিন্দু গুলির ঠিক মধ্য বা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে সৌরকিরণ পতিত হয়, তাহাতে অতি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার শক্রধনু উদ্ভূত হয়, নিম্নে পতিত হইলে ম্লান ও প্রভাহীন ধনু প্রকাশ পায়। আকাশে দুই শক্রধনু উদিত হইবারও এই কারণ। যদি সকল বৃষ্টিধারাতে সূর্য্যরশ্মি সমান রূপে পতিত হইত, তাহা হইলে অভিন্ন রূপ একটী অতি প্রশস্ত ধনুই দেখা যাইত। এই দুই ধনুর উপর্য্যধোভাগে কোন সময় অতি ম্লান বর্ণ যুক্ত কতি-পয় অতিরিক্ত ধনুও দেখা যায়। অধঃস্থ প্রধান ধনুতে বায়লেট, ধূমল, নীল, হরিত, পীত, পাটল, লোহিত এই সাত বর্ণ যথাক্রমে দৃষ্ট হয়। পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা প্রধান ধনুর প্রত্যেক বর্ণের আয়তন পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহা ৪০° ১৭ʹ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হইবে না। নিম্নস্থ ধনু অপেক্ষা উপরের ধনু দ্বিগুণ বড় এবং উহাতেও পূর্ব্বোল্লিখিত সাত প্রকার বর্ণ দেখা যায়, ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে; অধঃস্থ ধনুর সর্ব্বোপরিভাগে যে লোহিত বর্ণ থাকে, ঊর্দ্ধের ধনুতে সেই বর্ণ নিম্নদেশে দেখা যায়; আর নিম্নস্থ ধনুর সর্ব্বাধোভাগে যে বাওলেট পুষ্পের রঙ্গ দেখা যায়, উপরের ধনুর সর্ব্বোপরি তাহাই দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা শক্রধনুর স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। প্লিনি ও প্লুটার্ক উহার অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, পরিশেষে বিফল-প্রযত্ন হইয়া কহিয়াছিলেন যে উহার স্বরূপ নির্ণয় করা মনুষ্যক্ষমতার অতিরিক্ত। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌টোনিও ডি, ডমিনিস্ অনেক চেষ্টার পর স্থির

করিয়াছেন যে, কোন গোলাকার স্বচ্ছ পদার্থে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেই শক্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যের সম্মুখে কাচপিণ্ড ধারণ করিলেও শক্রধনুর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, গোলাকার স্বচ্ছ পদার্থে সূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ হইলে যে শক্রধনুর উৎপত্তি হয়, বৃষ্টিকালে আকাশে ধনুর উদয়ে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐ প্রকার প্রণালী অনুসারে কৃত্রিম শক্রধনু প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিবিধ বর্ণ উৎপত্তির বিষয়ে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। তৎপরে বিশ্ববিখ্যাত সার আইজাক নিউটন প্রথমতঃ ইউরোপখণ্ডে ঐ ধনুর উৎপন্ন হইবার কারণ প্রকাশ করেন, এবং তদনন্তর অনেক বিজ্ঞ-লোক উহার অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইন্দ্রধনু।

হে মানব! কর দেখি ঊর্দ্ধে বিলোকন,
অতুল সম্পদ ঐ যে, ভবের আগারে,
অন্তরীক্ষে মরি কিবা অপরূপ শোভা!
মানস-মোহন যথা বসন্ত কুসুম,
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে। কিম্বা কাচ খণ্ডে,
দেখা যায় যদি, সৌরকর রাশি, শ্বেত,
পীত, নীল, লোহিত, ধূমল, আর আর

স্বর্ণ যত পায় প্রভা প্রতিক্ষণ। মরি
ঈক্ষণ সময়ে! সে যে নয়ন রঞ্জন;
মানস রঞ্জন। কিম্বা কলাপী, জীমূতে
হেরিয়া, হায়রে! যবে প্রেমানন্দে পূরি
বিস্তারি স্বপুচ্ছ গুচ্ছ, নাচে ঊর্দ্ধ পুচ্ছ
করি, রবিকর পড়ি তাহার উপরে
আবার বাড়ায় তারে, যেন কোটী কোটী
বিবিধ বর্ণের মণি মিলিলে একত্র
ঝক্ ঝক্ জ্বলে। নভে উদিলে চপলা,
যথা দশ দিশ তমোহীন সে রূপেতে।
হেরে তার রূপ, কেনা চায় তার দিকে?
মোহিত না হয় কেবা? তাহার শোভায়।
সে যে শোভা, আহা মরি ভুবনমোহন!
তেমতি হে ইন্দ্রধনু, আলো করি দিক্,
গগণে উঠেছ নানা রঙ্গে রঞ্জি দেহ,
বক্রভাব ধরি। কিহেতু উদয় তব
বল না আমায়, শুনি সেই বিবরণ,
লোকে বলে ওহে ধনু বারিবিন্দুপরে
পড়িলে রবির কর, তোমার উদ্ভব।
হয় হোক তাতে মোর নাহি প্রয়োজন।
যে জন অখিলস্বামী, যাঁহার আজ্ঞায়,
রবি, শশী করে কর দান; সমীরণ,
সতত জীবের রাখে প্রাণ; বারি, বহ্নি,
জীবের মঙ্গল তরে, ভুবন ভিতর,

তরু, গুল্ম, পশু, পক্ষী, সাগর ভূধর,
প্রকাশে যাহার কীর্ত্তি, এ মহীমণ্ডলে।
অপার মহিমা তাঁর, প্রকাশিতে তুমি
ধরিয়া মোহন বেশ, সময়ে সময়ে,
দেখা দাও আসি, বুঝি ভবের আগারে।

. এ, গে, ৭৪৩

শ্রীজানকীনাথ সরকার। মাটীয়ারি।

শিশির।

আমরা সর্ব্বদা যে নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহার কারণ অতি সহজ ভাবিয়া তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করি না। দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা আপন্ন আপনই হইয়া থাকে, পৃথিবীর আহ্নিক গতিই যে তাহার কারণ ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া নির্দ্ধারিত হয় না। সেই রূপ শিশির। আমরা প্রায় সর্ব্বদাই শিশির সঞ্চারিত হইতে দেখিতে পাই, সুতরাং তাহার কারণ অতি সামান্য বোধ করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণে মনোনিবেশ করিনা। এই নিমিত্ত শিশির সঞ্চারের বিষয় ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া উহার তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

আমরা প্রথমে শিশির সঞ্চারের কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া, তদ্বিষয়ে অতি প্রাচীনকাল হইতে যে ভ্রমাত্মক মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে যে রূপ মত ছিল, তাহা শুনিলে এক্ষণে সকলেই হাস্য করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিতেন যে, চন্দ্র ও নক্ষত্র হইতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ পতিত হয় তাহাই শিশির। কিন্তু পণ্ডিতবর আরিষ্টটলের মত উহা-দিগের অপেক্ষা সমধিক বিশুদ্ধ ছিল। যাহা হউক, উক্ত বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক বলিয়া ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, সম্প্রতি আমরা তাহারই উল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জলের অবস্থা দুই প্রকার, বাষ্পীয় ও তরল। জল স্বভাবতঃ তরল অবস্থাতেই থাকে, কেবল তাপ সংযোগে উহার বাষ্পীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। বায়ুরাশিতে শুষ্ক বায়ু ও জলীয় বাষ্প এই দুই পদার্থ আছে। কিন্তু এই দুই প্রকার পদার্থ পরস্পর রাসায়নিক অমিশ্র ভাবে অবস্থিতি করে। যদিও অমিশ্র ভাবে অবস্থিতি করে, তথাপি এক নৈসর্গিক নিয়মের অনুসারে এরূপে একটী স্থান ব্যাপিয়া থাকে যেন উভয়ে মিলিত হইয়াই রহিয়াছে বোধ হয়। বায়ুরাশির জলীয় বাষ্পাংশের পোষণার্থই জল হইতে নির-ন্তর বাষ্প উঠিয়া থাকে।

যদি জলের উপরিভাগ কোন রূপ আবরণে আবৃত না থাকে, তবে সর্ব্ব প্রকার তাপাবস্থাতেই জল বাষ্প রূপে উত্থিত হয়। অতএব অনাবৃত স্থানে জল থাকিলে তাপাব-স্থানুসারে তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং সেই বাষ্প

যাবৎ উপরিস্থিত বায়ুরাশিকে আর্দ্র করিতে না পারে, তাবৎ অবিশ্রামে উত্থিত হইয়া বায়ু মধ্যে প্রবেশ করে। যদি কোন দিন দিবা ভাগে বায়ুর তাপাংশ ৭০° বা ৮০° হয়, তবে জল হইতে অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিয়া ঐ বায়ুরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে আদ্র করিবে, কিন্তু ঐ দিন রাত্রিতে যদি তাপাংশ ৪০° হয় ও তন্নিবন্ধন বায়ুরাশি শীতল হইয়া পড়ে, তবে আর জলীয় বাষ্প উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে সকল বাষ্প প্রবেশ করিতে না পারে, তৎসমুদায়ই ঘনীভূত হইয়া শিশিরে পরিণত হয়। এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কি রূপে বায়ুরাশি শীতল হয়। সূর্য্য না থাকিলেই যে বায়ু শীতল হয়, কেহই এমন প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। অপরাহ্নে বা সন্ধ্যা সময়ে তাপের হ্রাস হইতে পারে বটে, কিন্তু একবারে শীতল হইবার সম্ভাবনা কি। বাস্তবিক বস্তুর তাপবিকিরণ দ্বারাই ঐ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন তাপাবস্থাপন্ন বস্তু পরস্পর সন্মুখীন থাকে, তাহা হইলে অধিকতর তাপযুক্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প তাপবিশিষ্ট বস্তুর উপর তাপ বিক্ষিপ্ত হয়। যেমন সূর্য্য ও পৃথিবী। সূর্য্য অধিকতর তাপযুক্ত, আর পৃথিবী তদপেক্ষা অল্পতাপ, সুতরাং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপর তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে। অতএব দিবাভাগে পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, সেই অংশ সূর্য্যবিক্ষিপ্ত তাপ গ্রহণ করে এবং তদপেক্ষা স্বল্পতাপ বস্তুর উপর ঐ গৃহীত তাপ বিকিরণ করে। ঐরূপ বায়ুও সূর্য্য হইতে তাপ গ্রহণ ও তদপেক্ষা

শীতল বস্তুর উপর তাপ বিকিরণ করে। কিন্তু আপাততঃ এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, কেবল উপরিস্থিত বায়ুই অধিকতর উত্তপ্ত ও সমধিক তাপযুক্ত হয়। ফলতঃ তাহা হয় না। নিম্ন লিখিত দুইটী যুক্তি দ্বারা ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইবে। প্রথমতঃ, উপরিস্থ বায়ু স্বভাবতঃ অতি বিরল, সুতরাং উত্তপ্ত, অতএব উহা সূর্য্যবিক্ষিপ্ত তাপ গ্রহণ না করিয়া বরং ঐ তাপ নিম্নস্থ বায়ুস্তরে সঞ্চালন করিয়া দেয়। উহা দ্বারা নিম্নস্থ বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তন্নিম্নস্থ অন্য এক বায়ুস্তর আসিয়া উহার স্থানে উপস্থিত হয়, ক্রমে তাহাও আবার উত্তাপিত হইয়া উপরে উঠে। এই রূপে বায়ুরাশির সর্ব্ব স্থানই প্রায় সমতাপাবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে যে তাপ বিকিরণ হইয়া থাকে, তাহাতে পৃথিবীর উপরিভাগের তাপবাস্থার হ্রাস হয়। কিন্তু উহা দ্বারা বায়ুরাশির তাপাবস্থার বৃদ্ধি হয় না, বরং সর্ব্ব নিম্নস্থ বায়ু পৃথিবীতে তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়ে। তখন উহা আর উপরে উঠিতে পারে না। দিবাভাগে যে সমুদায় বাষ্প উঠিয়া থাকে, তৎসমুদায় আর ঐ শীতল বায়ুতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া শিশির রূপে পরিণত হয়।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, শিশির বৃষ্টির ন্যায় ধারাবাহী হইয়া পড়ে না কেন? তাহার উত্তরস্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, যখন জল বাষ্প রূপে পরিণত হয়, তখন তেজ ঐ বাষ্পের অন্তর্ভূত থাকে। পরে যখন ঐ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরাকার ধারণ করে,

তখন উহার অন্তর্ভূত তেজ বহির্গত হইয়া বায়ুস্তরে প্রবেশ করে, সুতরাং ঐ বায়ুস্তর উত্তাপিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং ঊর্দ্ধস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুস্তর অধোগামী হইয়া তাহার স্থানে আইসে। ঐ স্তর আবার ঐ রূপে উষ্ণ হইয়া উপরে উঠে; পুনর্ব্বার উপরিস্থ বায়ুস্তর নিম্নে আইসে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সর্ব্ব নিম্নস্তরেই শিশির সঞ্চার হয়। যদি ঊর্দ্ধস্থ বায়ুস্তরে শিশিরের সঞ্চার হইত, তাহা হইলেই ধারাবাহী হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত।

অতি উচ্চ স্থানে যে একবারে শিশির সঞ্চার হয় না এমত বলা যায় না। দ্রব্যের বিকিরণ শক্তি অনুসারে অতি উচ্চ স্থানেও শিশির সঞ্চার হইয়া থাকে। যদি এক খান কাচের মধ্যস্থলে এক খণ্ড টিনের পাত বসান যায়, তাহা হইলে টিনের পাত শুষ্ক থাকিবে, কাচ খানি শিশিরে আর্দ্র হইয়া যাইবে। ইহা দেখা গিয়া থাকে যে, সেজের বাহির অপেক্ষা ভিতরে এবং তাম্র ফলকের উপর অপেক্ষা নিম্নে অধিকতর শিশির সঞ্চার হইয়া থাকে ইহার কারণ কি? বায়ুর অস্থির ভাবই ইহার কারণ। উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে এবং শীতল বায়ু নিম্নে পতিত হয়। আর কাচ ও তাম্র তাপ সঞ্চালন করে এবং যত তাপ সঞ্চালন করে ততই আবার আপন আপন স্তুপ হইতে তাপ গ্রহণ করে। পুনর্ব্বার উহা নিম্নস্থ বায়ুরাশি হইতে তাপ গ্রহণ করে, সুতরাং নিম্নস্থ বায়ু শীতল হইয়া শিশির সঞ্চার করিয়া থাকে।

ঘনাবৃত রাত্রিতে শিশির সঞ্চার হয় না কেন জিজ্ঞাসিত হইলে, এই উত্তর প্রদান করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গ সন্তুষ্ট

হইবেন। নির্ম্মল আকাশে তাপ বিকিরণের কোন প্রতিবন্ধক থাকে না; সুতরাং যথোচিত রূপে তাপ বিকীর্ণ হওয়াতে শিশির সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পৃথিবী তাপ বিকিরণ করিলে যে পরিমাণে উহার তাপের হ্রাস হয়, উহা আবার সেই পরিমাণে মেঘবিকীর্ণ তাপ গ্রহণ করে, সুতরাং উহা অতি অল্প পরিমাণে শীতল হয়। এই নিমিত্তই শিশির সঞ্চার হয় না। বায়ু প্রবল হইলে শিশির সঞ্চার হয় না তাহার কারণ এই যে, কোন এক বায়ুস্তর পৃথিবীর উপরে স্থিরভাবে থাকিয়া শীতল হয় না। পর্ব্বতশৃঙ্গ অপেক্ষা উপত্যকা ভূমিতে অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চার হইয়া থাকে। বায়ুর অস্থিরত্বই তাহার এক মাত্র কারণ। সমধিক শৈত্য দ্বারা শিশির অধিকতর ঘণীভূত হইলে তাহাকে বরফ্ কহে। শিশির উদ্ভিজ্জের যেমন মহোপকারী তেমনই বরফ আবার অনিষ্টকারী। যদি শিশির সঞ্চার না হইয়া ক্রমাগত বরফ জন্মাইত, তাহা হইলে সমস্ত উদ্ভিজ্জ একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। করুণানিধান পরমেশ্বর যে নিয়ম দ্বারা এই অনিষ্টকর বরফ হইতে উদ্ভিজ্জ রক্ষা করিতেছেন, তাহা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

পদ্মা নদী।

"কেগো তুমি? গর্ব্বভরে অতিক্রমি তীর,
গম্ভীর ভীষণ রবে করি হুঁহুঁ ধ্বনি,
নিয়ত জীবের কর্ণ করিছ বধির,
ভয়াকুল প্রাণ শুনি যার প্রতিধ্বনি।

পর্ব্বতদুহিতা তুমি, বুঝেছি এখন,
পদ্মা তব নাম, অতি ভয়ঙ্কর বেশে
প্রচণ্ড আবর্ত্ত কত করিয়া ধারণ,
যাও কল কল রবে সাগর উদ্দেশে।

প্রবলরূপিণী তব মূরতি ভীষণ!
কত তরি গ্রাসিতেছ সংখ্যা নাহি তার,
বহিত্র চালনে যেই অতি বিচক্ষণ,
হেরি তোমা তারো হয় ভয়ের সঞ্চার।

প্রচণ্ড প্রবাহ তব ভীষণ দর্শন!
অবিরত কোলাহলে, মহা কোলাহলে
বিশাল তরঙ্গ বাহু করি উত্তোলন,
ভাঙ্গিতেছে তটদেশ ভয়ানক বলে।

যে তোমায় অয়ি ধুনি! করেনি ঈক্ষণ,
শুনি তব কথা কিন্তু পেয়ে অতি ভয়,
মন্ত্রৌষধ-রুদ্ধবীর্য্য উরগ মতন,
আকুলিত মনে সেও নম্রশির হয়।

কিন্তু নাহি ভাবি আমি, সেই ভয়ঙ্কর
ভাব, যাতে ভীত-মনা হয় জনগণ,—
বহু কাল পরে তব শুনি কলস্বর,
অপূর্ব্ব ভাবেতে মন হতেছে মগন।

দুগ্ধস্বরূপিণী তুমি জন্ম ভূমি-স্তনে,
সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ পয়ঃ করি সদা দান,
ভেদাভেদ জ্ঞান কিছু না ভাবিয়া মনে,
তুষিতেছ জীবকুল, সকলে সমান।

নির্ম্মল সৈকত তব অঙ্ক চারুতর!
সদা তাহে জীবগণ করিছে বিহার,
সাধারণ ধাত্রী তুমি সবার উপর,
সমভাবে বিতরিছ, দয়া অনিবার।

তোমার প্রসাদে হয় স্বভাব সুন্দর।
অপরূপ ইন্দ্রজাল জান, পদ্মে! তুমি,
তব সুনির্ম্মল জলে হইয়া উর্ব্বর,
সুমধুর ফল ফলে হাস্যমতী ভূমি।

কি আর কহিব তোমা অয়ি কলস্বরে!
যাবে যবে পয়ো দিয়া জলধি তুষিতে।
এ মিনতি তার কথা বলিও সাগরে,
যে গাইল তার নাম বঙ্গের সঙ্গীতে"।

বিদ্যুৎ।

অগ্নি ও আলোকের ন্যায় বিদ্যুৎ এক স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। তাপ যে প্রকার পৃথিবীর পদার্থে বিদ্যমান আছে, বিদ্যুৎও সেইরূপ সৃষ্টির সকল পদার্থে বর্ত্তমান আছে। তাপ যে প্রকার পদার্থের পরমাণুতে অন্তর্হিত থাকে, বিদ্যুৎও সেই প্রকার পদার্থ মাত্রের পরমাণুতে অন্তর্হিত বা অপ্রকট থাকে। যে প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত হইলে তাপ নিঃসৃত হয়, সে প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত অথবা উৎতপ্ত বা অন্য কোন কারণে অবস্থান্তরিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা বিদ্যুতের পরিচালক অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার কোন অংশ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপন করে; অপর কতকগুলি পদার্থ অপরিচালক অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার উপর দিয়া চলিতে পারে না। ধাতু, জল, সিক্ত উদ্ভিদ্ প্রভৃতি দ্রব্য সকল পরিচালক, ও কাচ, লাক্ষা, রবর, শুষ্ক বায়ু প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। কোন দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া পুষ্ট বা ত্যক্ত হয়, তাহা নিকটে পরিচালক পদার্থ পাইলে, অমনি চলিয়া যায়, প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু নিকটে পরিচালক পদার্থ না থাকিলে যে দ্রব্যে উৎপন্ন হয় তাহাতেই থাকে। পরন্ত এক বস্তুতে ঐ প্রকার পুষ্ট বিদ্যুৎ ও নিকটস্থ অন্য এক বস্তুতে অন্তর্হিতাবস্থ অপ্রকট বিদ্যুৎ থাকিলে উভয় পদার্থের বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ও পদার্থ নিকটস্থ হইলে পুষ্ট

বিদ্যুৎ যে পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকরূপে অপ্রকট-বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থে পতিত হয়। বিদ্যুতের এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে গমন সময়ে আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন ইহা এক মেঘ-পিণ্ড হইতে অন্য মেঘপিণ্ডে গমন করে, তখন যে আলোক হয়, তাহাকেই লোকে বিদ্যুৎ কহে। বিদ্যুতের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে একটী নাম "তড়িৎ" এবং প্রকট ও অপ্রকট ভেদে ইহা পদার্থবিদ্যায় "পুষ্ট তড়িৎ" ও "ক্ষীণ তড়িৎ" বলিয়া অভিহিত হয়।

যদি একটী পরিচালক পদার্থ একটী অপরিচালক পদার্থের সহিত একত্রিত, ঘর্ষিত বা রাসায়ণিক নিয়মে দ্রবীভূত হয়, তাহা হইলে যেটী পরিচালক তাহাতেই পুষ্ট তড়িৎ এবং যেটী অপরিচালক তাহাতেই ক্ষীণ তড়িৎ প্রকাশমান হয়।

যে যে বস্তুতে সমানবর্ণ তড়িৎ মুক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে, আর যে যে বস্তুতে অসমান বর্ণ তড়িৎ মুক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে।

স্বভাবতঃ প্রত্যেক বস্তুতেই দুই প্রকার তড়িৎ সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যখন কোন বস্তুতে পুষ্ট তড়িতের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষীণ তড়িতের পরিমাণ অধিক হয়, তখন ঐ ক্ষীণ তড়িতের অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্ত বা প্রকাশমান তড়িতের কার্য্য করে। ঐ রূপ যখন কোন বস্তুতে ক্ষীণ তড়িৎ অপেক্ষা পুষ্ট তড়িতের ভাগ

অধিক হয়, তখন সেই পুষ্ট তড়িতের ঐ অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্তভাবে অবস্থিতি করে। এই মুক্ত তড়িতই যাবতীয় কার্য্যসাধন করে; ইহাই আকাশ হইতে আসিয়া গৃহাদি ধ্বংশ করে, তারের মধ্য দিয়া বার্ত্তাবহন করে, শরীর পোষণ করে এবং যাবতীয় সংযোগ বিয়োগ সাধন করে।

বিদ্যুৎ দুই প্রকারে পরিচালিত হয়, যথা অন্তঃপরিচালন ও বহিঃপরিচালন। যে পরিচালক বস্তুর অভ্যন্তরস্থ তড়িৎ-দ্বয় সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে, তাহার নিকটে যদি মুক্ত তড়িৎ-বিশিষ্ট একটী বস্তুকে আনিয়া স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ঐ পরিচালক বস্তুর তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়া উহার প্রান্তাভিমুখে গমন করে; তন্মধ্যে যেটী উক্ত মুক্ত তড়িতের অসমানবর্ণ, তাহা তদভিমুখীন প্রান্তে এবং যেটী উহার সমান বর্ণ, তাহা অপর প্রান্তে উপনীত হয়। অপরন্তু ঐ বস্তুর সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় বিযুক্ত হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিলে, ঐ মুক্ত তড়িৎ ও তদাকৃষ্ট অসমান বর্ণটীর মধ্যে একটী আপন অবস্থান পদার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যটীর সহিত যাইয়া মিলিত হয়, এবং তাহাতে উভয়েই সাম্যা-বস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পরিচালনকে বহিঃপরিচালন বলা যায়। এই বহিঃপরিচালনকে অন্তঃপরিচালনের চরমা-বস্থা বলিলেই উপযুক্ত হয়।

যদি দুই প্রকার তড়িৎ দুইটী বস্তুর সমানরূপ প্রান্তে থাকিয়া পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে যে তড়িৎটী প্রবল, সেইটী আপন আশ্রয়ভূত প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া মধ্যবর্ত্তী বায়ু ভেদ করতঃ অপরটীর সহিত মিলিত

হয়। কিন্তু যদি ঐ দুইটী প্রান্তের মধ্যে একটী স্থূলতর এবং অপরটী সূক্ষ্মতর হয় এবং যদি দুইটী বস্তুই তুল্যরূপ পরিচালক হয়, তবে স্থূলাগ্রস্থিত তড়িৎ প্রবলতর হইলেও অগ্রসর হইতে পারে না। এস্থলে সূক্ষ্মাগ্রস্থিত তড়িৎটী আপন আধার হইতে স্খলিত হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া অপরটীর সহিত মিলিত হয়। পিত্তলনির্ম্মিতএকটী গোলা আর একটী সূচী এই দুয়ের মধ্যে গোলাটীতে প্রবলতর তড়িৎ থাকিলেও, সূচ্যাগ্রস্থিত তড়িৎ অগ্রসর হইয়া গোলাস্থিত তড়িতের সহিত মিলিত হয়।

দুইটী অসমপরিচালক পদার্থ (তাম্র ও দস্তা) কিয়ৎপরিমাণ জল ও অম্ল প্রভৃতি কোন দ্রবকারক পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে দুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভুত হয়। এইরূপ যন্ত্রকে রাসায়নিক তড়িৎযন্ত্র বলে; কিন্তু ঐ যন্ত্রের দুইটী পরিচালক পদার্থের সহিত যে দুইটী ধাতুর তার সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগের বহিঃপ্রান্ত পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হইলে ঐ যন্ত্রের মধ্যে তড়িতোৎপত্তি হয় না।

বিদ্যুৎ জগতের সকল পদার্থে বিদ্যমান আছে, সুতরাং সর্ব্বত্র উহার প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির সময় উহার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। উষ্ণ দেশে উহার যে প্রকার প্রভাব, শীত-প্রধান দেশে উহার তাদৃশ বৃদ্ধি দেখা যায় না; কিন্তু তথায় বিদ্যুৎ অল্প আছে এমত নহে; সর্ব্বত্রই সমান পরিমাণে আছে, কেবল বিবিধ নৈসর্গিক কারণে তাহা বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হয়। লাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে একপ্রকার জ্যোতিঃ নভোমণ্ডলে ব্যক্ত হয়, তাহা

প্রকৃত বিদ্যুৎ, কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া স্থিরসৌদামিনীবৎ আকাশের কিয়দ্দেশ ব্যাপিয়া থাকে। বিলাতে ইহাকে "অরোরা বোরিএলিস কহে।

মেঘ বারিবিন্দুর সমষ্টিমাত্র। বিদ্যুতের প্রভাবে এই বারিবিন্দু সকল মেঘাকারে থাকে। মেঘপিণ্ড সকলের ঘর্ষণ ও আহননে ঐ তড়িৎ পুষ্ট হইয়া নির্গত হইলে, বারিবিন্দু আর মেঘরূপে থাকিতে পারে না, সুতরাং বৃষ্টিরূপে নিপতিত হয়। ফলতঃ, বিদ্যুৎ নির্গমনই বৃষ্টির এক প্রধান কারণ। কিন্তু সকল সময়ে ঐ নির্গমন প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু মেঘপিণ্ডের নিকট শুষ্ক বায়ু থাকিলে বিদ্যুৎ আলোকরূপে নির্গত হয়, কিন্তু শিক্ত বায়ু থাকিলে গোপনে পরিচালিত হয়, প্রত্যক্ষ হয় না। বিদ্যুৎ জ্যোতিঃরূপে এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে যখন গমন করে, তখন বায়ুর উপর তাহার প্রতিঘাত দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেঘে কোন প্রকার মুক্ত তড়িতের আবির্ভাব নিবন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্য উদ্ভূত হইলে বাষ্পরাশি জমিয়া শিলা রূপ ধারণ করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

বজ্র বিদ্যুৎ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। উপরে যে শব্দের কথা লেখা হইল তাহাই বজ্র। বিদ্যুৎ এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে প্রবেশ না করিলে, যখন উহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন সেই বিদ্যুতের পতন ও শব্দকে লোকে "বজ্র" কহে। নিকটস্থ সকল মেঘপিণ্ডে তুল্য পরিমাণে পুষ্টতড়িৎ থাকিলে, তাহা পৃথিবীর ক্ষীণ তড়িৎ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, বজ্রাঘাতের এই এক মাত্র কারণ। যে যে

পদার্থ পুষ্ট বিদ্যুদ্বিশিষ্ট মেঘের নিকটে থাকে, তাহাতে অধিক বজ্র পতন হইবার সম্ভাবনা। নিম্ন অপেক্ষা উচ্চ পদার্থেই অধিক বজ্র পড়ে, এপ্রযুক্ত তাল নারিকেলাদি বৃক্ষে যত বিদ্যুৎ পড়ে তত আর কোন পদার্থে পড়ে না। একতালা গৃহ অপেক্ষা দুই তালা গৃহে অধিক বজ্র পড়ে, এবং দুই তালা অপেক্ষা তিনতালায় অধিক পড়ে। অপর, অপরিচালক পদার্থাপেক্ষা পরিচালক পদার্থে তাড়িতের আকর্ষণ অধিক, সুতরাং ইষ্টক গৃহাপেক্ষা লৌহাদি গৃহে অধিক বজ্র পড়িবার সম্ভাবনা।

বজ্রভয়-নিবারণের জন্য বাজবন্ধ লৌহশলাকাই প্রশস্থ, যেহেতুক লৌহ পরিচালক, এবং সেই শলাকার সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা মেঘস্থ পুষ্ট তড়িৎ গোপনে ভূমিতে নীত হয়, বজ্রধ্বনি বাটীর কোন অনিষ্ট করে না। লৌহশলাকা বাটীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করা উচিত। শলাকার অগ্র ভাগটী বাটীর শিখরদেশ হইতে অভাবতঃ পাঁচ হাত উচ্চ থাকা উচিত। লৌহশলাকার যে অগ্র আকাশদেশে থাকিবে, তাহা সূক্ষ্ম করা বিধেয়; তাহা স্থূল গোলাকার হইলে বজ্রাঘাতের আপৎ অধিক ঘটিবার সম্ভাবনা। ঐ শলাকার যে প্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত হইবে, তাহা ভূমির দুই হস্ত নিম্ন অবধি পোতা কর্ত্তব্য। অপর, ঐ শলাকা বাটীর প্রাচীর হইতে অন্তরে রাখা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তাহা প্রাচীরের সর্ব্বত্র স্পর্শ করিয়া থাকে এমত করা কর্ত্তব্য, ও মধ্যে মধ্যে লৌহ বন্ধন দ্বারা তাহা প্রাচীরে আবদ্ধ করা উচিত।

তড়িতের যে যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, চুম্বকেও প্রায় সেই সকল ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। চুম্বকদণ্ডের এক প্রান্তকে উত্তর এবং অপরটীকে দক্ষিণ প্রান্ত বলা যায়; কারণ দণ্ড শায়িতভাবে আলের উপর স্থাপিত হইলে, একটী প্রান্ত নিয়তই উত্তর এবং অপরটী নিয়তই দক্ষিণ-দিক্ নির্দ্দেশ করিতে থাকে। যদি দুইটী চুম্বকদণ্ড পরস্পর সন্নিকটে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে দুইটী দণ্ডের স্বজাতীয় প্রান্তদ্বয় বিকর্ষণ বশতঃ বিযুক্ত এবং বিজাতীয় প্রান্তদ্বয় আকর্ষণ বশতঃ সংযুক্ত হয়।

যদি দুইটী চুম্বকদণ্ডের অসমান বর্ণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংস্পৃষ্টভাবে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয়েরই চুম্বকশক্তি স্থির থাকে, কিন্তু যদি তাহাদিগের সমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় কিছু দিন সংস্পৃষ্টভাবে থাকে, তাহা হইলে যে বিকর্ষণ বেগ উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা উভয়েরই চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। চুম্বকদণ্ডকে অগ্নিতাপে তপ্ত করিলেও তাহার শক্তি নষ্ট হয়।

চুম্বকের দুই প্রান্তেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ প্রবল। প্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া যতই মধ্যস্থান অভিমুখে যাওয়া যায়, ততই উক্ত গুণদ্বয়ের লাঘব লক্ষিত হয়। পৃথিবীতে যথেষ্ট চুম্বক-ধর্ম্ম আছে। লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থ ইহার সংস্পর্শে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার যে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত আছে, তাহাদিগের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলেই যাবতীয় চুম্বক দণ্ড আলের উপর শায়িত ভাবে স্থাপিত হইলে উত্তর ও দক্ষিণ দেশ নির্দ্দেশ করিতে থাকে। দিক্প্রদর্শক যন্ত্রের মধ্যে যে চুম্বকশলাকা

আছে, তাহার উত্তর প্রান্ত পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত দ্বারা এবং দক্ষিণ প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়াই তাহা দিক্‌প্রদর্শক হইয়াছে।

যুদ্ধকালে কর্ণের উৎসাহ বাক্য।

দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথি।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ছন্নমতি ॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির ॥
কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনি ॥
বধিব সকল আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র লহরি যেন রক্ষা করে কূলে ॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি ॥
খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়।
দশদিকে যুড়িয়া করিব অস্ত্রময় ॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে ॥
পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন ॥

কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলী॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাব গবী লয়ে হস্তিনা নগর॥
অথবা দেখহ যুদ্ধ অন্তরে থাকিনা।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥ মঃ ভাঃ

ভূমিকম্প।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, তাপ বাহুল্য প্রযুক্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ তরল হইয়া আছে। ইহার উপরিভাগ মাত্র কঠিন এবং সেই কঠিন ভাগের উপরি সমুদ্র, বন, সাগর, নদী প্রভৃতি সমুদায় অবস্থিত রহিয়াছে। যদি কোন কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ঐ তরল পদার্থের কোন অংশ উচ্ছলিত হইয়া আন্দোলিত হয়, তবে ঐ অংশের উপরিস্থিত কঠিন ভাগও বলপূর্ব্বক উত্তোলিত হইবে এবং সেই স্থানের চতুর্দ্দিক উর্ম্মিমান হইয়া বিলোড়িত হইতে থাকিবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ তরল পদার্থে কোন কারণে জলসংযুক্ত হইলেই বাষ্প জন্মে, সেই বাষ্প উদ্গত হইবার চেষ্টা করে, তাহাতে ঊর্দ্ধদিকে আঘাত হয় এবং সেই আঘাতের বলেই পৃথিবীর উপরিভাগ একস্থানে স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ভূমিকম্প জন্মে। রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, চূর্ণ বীজ, ক্ষার বীজ, মৃদবীজ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুবিশেষ পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিহিত

আছে, তাহাতে জলের স্পর্শ হইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, ও সেই অগ্নি তত্রত্য প্রস্তর-মৃত্তিকাদি পদার্থকে দ্রবীভূত করে, এবং ঐ দ্রবপদার্থ সমস্ত বিস্তারিত ও পরস্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইয়া ভূমিকে কম্পিত করে ও স্থানে স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়া আগ্নেয় গিরির উৎপাদন করে। লৌহচূর্ণ ও গন্ধক যৎকিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে অল্প ক্ষণ মধ্যে সেই পদার্থের প্রস্ফোট হইয়া তত্রত্য চতুর্দ্দিগবর্ত্তী ভূমিকে কম্পিত করে। এই ঘটনাদৃষ্টে কোন কোন রসায়নবেত্তা কল্পনা করেন যে, গন্ধকমিশ্রিত লৌহের খনিতে জল নিপতিত হইলে প্রস্তাবিত উপদ্রব সমুৎপন্ন হয়।

সংস্কৃত "অদ্ভুত সাগর" নামক জ্যোতিষ সংহিতা শাস্ত্রের মতে পৃথিবীস্থ নানা ধাতুর সহিত সূর্য্যরশ্মির সংযোগাধীন কখন কখন দেশ বিশেষে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

ভূমিকম্প কেমন সময়ে হয় তাহার সবিশেষ অবধারিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যত ভূমিকম্পের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে, প্রায়ই অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিকে লক্ষ করিয়া ভূমিকম্প সমস্ত ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ইহা বলিয়া অন্য সময়ে যে ভূমিকম্প হয় না এমত নহে। ভূমিকম্পের কালের বিষয়ে অপর একটী ব্যাপার জানা গিয়াছে, উহা অধিকাংশ শীত ঋতুতে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাসের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। আরও চমৎকারের বিষয় এই যে, নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণে যথায় ঐ কয়েক মাস গ্রীষ্মের আধিক্য, তথায় উল্লিখিত

মাস অপেক্ষা অপর ছয় মাসেই, অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাসের মধ্যে অধিক সংখ্যক ভূমিকম্পের ঘটনা হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের কালসম্বন্ধে অপর একটী কথা এই যে, প্রায় একশত বৎসর অন্তর এবং প্রতি শতাব্দীর মধ্যভাগে অতি প্রবলতর এবং পরম অপকারক ভূমিকম্প সমস্ত সংঘটন হয়। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন নগরে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রিওবাম্বা নগরে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, এতদ্দ্বারা পর্ব্বত মূলস্থিত গ্রামের মনুষ্য পশ্বাদি পর্ব্বোতোপরি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কুইটো ও রিওবাম্বা নগর ৪০০০০ মনুষ্য-সহিত উক্ত কারণে এককালে ভূমিসম হইয়াছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কারাকস্ নগর দ্বাদশসহস্র প্রাণীসহিত ঐ আপৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। লাইসা নগর ভূমিকম্প দ্বারা পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে দুইবার বিনষ্ট হয়। চিলি দেশে কন্সেপ্‌শন্ নগর ১২০ বৎসরের মধ্যে ভূমি কম্পে তিনবার উৎসন্ন হইয়াছে।

ভূমিকম্প দ্বারা যে কেবল গৃহাদি বিনষ্ট হয় এমত নহে, নগরাদির ভূভাগ পর্য্যন্ত ওতপ্রোত হইয়া পড়ে। পৃথিবী স্থানে স্থানে স্ফুটিত হয়, প্রাচীন জলোৎস সকল বিলুপ্ত হয়, নূতন স্থান হইতে উৎস সকল নির্গত হয়। প্রাগুক্ত স্ফুটিত স্থান হইতে জল, বাষ্প, কর্দ্দম, ধূম, ধাতুমিশ্রবাদি পদার্থ অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। কথিত আছে, ইটালী

প্রদেশে ভূমিকম্প দ্বারা হর্কুলেনিয়ম ও পম্পেয়াই নগর বিংশতি হস্ত-মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়াছিল। ইংরাজি ১৮২২ অব্দে চিলি দেশের বাল্‌পরাসি নগরের উত্তরে ২৫ ক্রোশ ভূমি দুই হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় ৪৩ বৎসর হইল, কচ্ছ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে উক্ত নগর সন্নিহিত নদীর গর্ভ ২০ ফুট নিমগ্ন হইয়া যায়, আর তদ্দ্বারা ভুজনামা নগর ও তাহার চতুর্দ্দিগবর্ত্তী ভূমি নিমগ্ন হইয়া রন্ন নামক হ্রদে পরিণত হয়, ও তাহার এক ভাগে ৫০ ক্রোশ স্থান অতি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভূমিকম্পন তিন প্রকার, উৎক্ষিপ্ত কম্পন, উর্ম্মিবৎ কম্পন ও ঘূর্ণিত কম্পন। উৎক্ষিপ্ত কম্পনে বোধ হয় যেন ভূমি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। উর্ম্মিবৎ কম্পনে ভূমি জল-তরঙ্গের ন্যায় বিচলিত হয়, সামান্য ভূমিকম্প প্রায় এই প্রকারেই হইয়া থাকে; এবং ঘূর্ণিত বা অর্দ্ধ ঘূর্ণিত কম্পনে গৃহ, বৃক্ষ ক্ষেত্রাদির স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যত ভূমিকম্প হয়, সকলেরই কেন্দ্র একটী আগ্নেয় গিরি, অথবা আগ্নেয় গিরির প্রদেশ এবং ভূমিকম্প ঐ প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করে। বঙ্গদেশে যে ভূমিকম্প হয়, তাহার কেন্দ্রস্থান জাবা দ্বীপে। ঐ দ্বীপে অনেক আগ্নেয় গিরি আছে, এবং যে সময়ে সেই গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেই সময়ে আমাদিগের দেশপর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। এই জন্যই এই দেশের ভূমিকম্প পূর্ব্বদিক হইতেই সঞ্চারিত

হইয়া থাকে। রাঙ্গুনে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহা জাবা দ্বীপ হইতে সমাগত হইয়াছিল, কিন্তু পেশোয়রের ভূমিকম্পের কেন্দ্র তাহার দক্ষিণপশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ঐ গতির বা কম্পোর্ম্মির বেগ কোন কোন স্থলে পরিমাণ করা গিয়াছে। কোথাও কোথাও উহা প্রতি মিনিটে ১৬ মাইল পথ গমন করে। ভূমিকম্পের গতি সর্ব্বদা এক প্রকার হয় না, কখন কখন স্থির সলিলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হয়। কখন বা ইহার গতি অণ্ডাকারে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং কখন কখন উহা অল্প পরিসর অতি দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়া একদিগে অগ্রগামী হয়।

ভূমিকম্পের স্থিতিকাল অত্যল্প, বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত প্রবল, তাহার স্থিতি ততই অল্প হয়। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কম্পন এক বিপল কালের মধ্যেই নিরস্ত হয়। কোন কোন স্থলে ভূমি কিয়ৎকাল আস্তে আস্তে কম্পিত হইয়া পরে এক বার অতি সবলে কম্পিত হয়, কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর ভূমিকম্প এককালেই ঘটিয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে প্রায় কোন স্বল্প কম্পন হয় না। ভূমিকম্পনের সময়ে পৃথিবীর মধ্যে গভীর ধ্বনি হইয়া থাকে। উক্ত ধ্বনি মেঘের গর্জ্জনবৎ কিম্বা দূরাগত কামানের ধ্বনির ন্যায় বোধ হয়। ভূমিকম্পনের সকল সময়ে যে শব্দ শ্রুত হয় এমত নহে, কোন কোন ভূমি কম্পে শব্দ শ্রুত হয় না, অপর কোন কোন স্থলে পৃথিবীর গর্ভে পুনঃ পুনঃ অতি ভীম নিনাদ আকর্নিত হইয়াছে, অথচ তৎসহ কোন ভূমিকম্পের অনুভব হয় নাই। ইতিবৃত্ত পাঠে ইহাই উপলব্ধ

হয় যে, পৃথিবীর পূর্ব্বার্দ্ধের সর্ব্বত্রই ভূমিকম্পব্যাপার প্রায় সমান সংখ্যায় ঘটিয়া থাকে। এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইউরোপে যে যে দেশে যতবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। সুইজর্লণ্ড এবং রাইণ নদীর আবাহিকা মধ্যে ১৭৩ বার; ব্রীটিস্ দ্বীপপুঞ্জে ১১০ বার; নরওয়ে, সুইডেন্ ও আইসলণ্ড মধ্যে ১১৩ বার; ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম্ এবং হলণ্ড মধ্যে২১১ বার, স্পেইন্ এবং পর্টুগেলের মধ্যে ৮৫ বার; ডেনুব নদীর আবাহিকা মধ্যে ৪৭৮ বার; গ্রীস এবং সিরিয়ার মধ্যে ১৫০ বার।

পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধের বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্প সংখ্যার অন্তরতা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। ঐ সময়ে অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে কানেডা এবং ইউনাইটেড্ দেশে ৫১ বার, মেক্সিকো এবং মধ্য-আমেরিকায় ৩০ বার; আণ্টিলী দ্বীপপুঞ্জে ১৮৫ বার; চিলি এবং লাপ্‌লেটা দ্বীপপুঞ্জে ১৭৫ বার ভূমিকম্প হইয়াছে।

যদিও ভিন্ন২ দেশীয় ভূমিকম্পের সংখ্যা পরস্পর নিতান্ত বিভিন্ন না হউক, তথাপি দেশভেদে উহার প্রাবল্যের অত্যন্ত তারতম্য হইয়া থাকে। আইসলণ্ড, স্পেইন, পর্টুগেল, ইটালির দক্ষিণাংশ, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বদেশ, কালিফর্নিয়ার দক্ষিণদিকস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদায় উপকূল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় উপকূল সমুদায় এই সকল স্থানে ভূমিকম্পের প্রাবল্য অধিক।

প্রমীলা বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া বীরস্ত্রীর ন্যায় উৎসাহ বাক্য প্রদান করিতেছে।

————————————— "পশিব নগরে;
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজ বলে,
রঘুশ্রেষ্ঠ, এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানবকুল-সম্ভবা আমরা দানবী;
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত—নদে, নতুবা ডুবিতে।
অধরে ধরিলো মধু; গরল লোচনে,
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে!
চল সবে হেরি রাঘবের বীরপনা।
দেখিব, যেরূপ দেখি শূর্পণখা পিসী,
মাতিলা মদন মদে পঞ্চবটী বনে,
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে নাগপাশ দিয়া,
বাঁধি লব বিভীষণে রক্ষঃ কুলাঙ্গারে,
দলিব বিপক্ষ দল মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ আকৃতি;
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি মাঝে!
—নাদিল দানব বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী যুথ যথা মত্ত মধুকালে!
নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে,

ডাকি শীঘ্র আন হেথা তোর সীতানাথে—
বর্ব্বর ; কে চাহে তোরে তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে,
ইচ্ছায় ! শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে !
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পলা বনবাসী।
কি ফল বধিলে তোরে অবোধ ? যা চলি ;
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক, ডাক বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ প্রমিলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন যোধ সাধ্য, মূঢ় বোধিতে তাঁহারে !

মেঃ নাঃ বঃ।

সৌর জগৎ।

অধুনাতন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা এই অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের যে খণ্ডে আমরা বাস করি, সূর্য্য তাহার কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী। আর কতকগুলিন গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু তাহার চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য গ্রহ মধ্যে পরিগণিত নহে ; যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথা নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত উহাও গ্রহ মধ্যে পরিগণিত। আর

যাহারা কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, ইহা এক উপগ্রহ, পৃথিবী গ্রহের পারিপার্শ্বিক মাত্র।

এই গ্রহ ও উপগ্রহ ব্যতীত শতাধিক ধূমকেতু অতি প্রচণ্ড বেগে সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য স্বয়ং জ্যোতিস্মান্, আর গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যে সমুদায় লোক সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, তাহারা স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট নহে, সূর্য্যের আলোকপাত দ্বারা ঐ রূপ প্রতীয়মান হয়। এমন মনোহর যে চন্দ্র সেও সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত না হইলে তাহার কিছু মাত্র শোভা থাকিত না।

সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ পরিভ্রমণ করে তৎসমুদায়কে সৌরজগৎ বলা যায়। গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য্যও সেই রূপ সমুদায় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুকে সমভিব্যাহারে করিয়া অন্য এক নক্ষত্রকে পরিভ্রমণ করে। এই পৃথিবী ও গ্রহগণের সম্বন্ধে যেমন সূর্য্য, সূর্য্যের সম্বন্ধে সেই নক্ষত্রও তদ্রূপ। সমুদায় সৌরজগৎ অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে নিমেষের নিমিত্তও স্থির নহে। ইয়ুরোপীয় ইদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রায় এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য্য, অর্থাৎ সূর্য্যসম একএক জ্যোতিষ্ক, নিজে তেজোময় এবং একএক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্ব মধ্যে আমাদের এই সৌর জগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহা-

রও সাধ্যনহে, এবং উহারা সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে স্বস্ব স্থানে নিয়ত কাল স্থিতি করিতেছি; কণা-মাত্র তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

মধ্যাহ্ন সূর্য্য। পদ্যমালা।

এখন উঠিয়া রবি মাথার উপর।
বরিষিছ গর্ব্বে বুঝি খরতর কর॥
নীচের স্বভাব তব উচ্চ পদ পেয়ে।
আপনার পরিণাম নাহি দেখ চেয়ে॥
নীচ পদে জন্মি ক্রমে উঠিয়াছ শীরে।
নামিতে হইবে নীচে পুনঃ ধীরে ধীরে॥
এখন দহিছ সব পদ-মদভরে।
পদহারা হয়ে লাজে ডুবিবে সাগরে॥
তোমার প্রতাপে রবি নাহি করি ভয়।
স্নিগ্ধকর বৃক্ষছায়া ব্যাপ্ত দেশচয়॥
বসিলে তাহার তলে করিবে ব্যজন।
যা কিছু হয়েছে ক্লান্তি হবে নিবারণ॥
কিন্তু যে হৃদয়ে বহ্নি তুষানল প্রায়।
জ্বলিতেছে ধিক্ ধিক্ দহিছে আমায়॥
খুজিলাম কত দেশ বন উপবন।
কোথাওত এ তাপ না হোল নিবারণ॥
কোথা সেই শান্তি-তরু স্পর্শি যার ছায়া।
শীতলিবে আমার এ দগ্ধীভুত কায়া॥

এই সকল বৃত্ত ব্যতিরিক্ত অন্য এক বৃত্ত ভূমণ্ডল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তির্য্যক্‌ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ অয়নান্তবৃত্তে লগ্ন হয় ও নিরক্ষবৃত্তোপরি দুই স্থানে তাহার সম্পাত হয়, তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। পৃথিবী হইতে বোধ হয় যে সূর্য্য এই ক্রান্তিবৃত্তোপরি ভ্রমণ করিতেছে; বস্তুতঃ ইহাই পৃথিবীর বার্ষিক গতির পথ, যাহাকে পৃথিবীর কক্ষ কহে। ক্রান্তিবৃত্ত নিরক্ষবৃত্তের উপরে বক্রভাবে পতিত হয়, এবং এই দুই বৃত্তের সম্পাত স্থানে ২৩°২৮´ পরিমিত কোণ জন্মে। ক্রান্তিবৃত্তের সহিত পরিধিবৃত্তের যে দুই স্থানে সম্পাত হয়, তাহার একটীকে বিষুবপদদ্বয় ও অপরটীকে মহাবিষুব পদ কহে। যৎকালে সূর্য্যকে বিষুবপদদ্বয়ে উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তখন দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়। সম্বৎসরে এই দুই ক্রান্তিপাত অথবা বিষুবপদে সূর্য্য দুইবার উদয় হয়; এ নিমিত্তে বৎসরের মধ্যে দুইবার দিনমান ও রাত্রিমান সমান হইয়া থাকে।

নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল এবং নিরক্ষবৃত্ত হইতে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত কল্পিত হয় তাহাদিগকে অক্ষবৃত্ত বা অক্ষসমান্তরাল কহে। নিরক্ষবৃত্ত হইতে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্বপরিমাণকে অক্ষ কহে। ঐ স্থান নিরক্ষের উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর এবং দক্ষিণে হইলে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর বলা যায়। পৃথিবীর পৃষ্ঠে আর কতকগুলিন অর্দ্ধবৃত্ত কল্পনা করা যায়, তাহারা প্রত্যেকে নিরক্ষবৃত্তকে লম্বভাবে ছেদ করে এবং এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত আয়ত, তাহাদিগকে মাধ্যাহ্নিক

রেখা বা দ্রাঘিমা কহে। অক্ষবৃত্ত ও দ্রাঘিমা রেখা, ইচ্ছামত পৃথিবীর সকল স্থানেই কল্পনা করা যাইতে পারে।

জ্যোতির্ব্বেত্তারা স্ব স্ব দেশীয় কোন স্থান বিশেষের মাধ্যাহ্নিক রেখা অবলম্বন করিয়া তথা হইতে দ্রাঘিমা অর্থাৎ দেশান্তরের দূরত্বগণনা আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বেত্তারা লঙ্কা ও উজ্জয়িনী এবং ইংরাজেরা গ্রিনুইচ, ও ফরাশীশেরা পারিস নগরের মাধ্যাহ্নিক রেখা হইতে দ্রাঘিমার গণনা করেন। এই মাধ্যাহ্নিক রেখাকে খগোলবেত্তারা প্রাথমিক মাধ্যাহ্নিক কহে। প্রাথমিক মাধ্যাহ্নিক বা দ্রাঘিমা রেখা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্বকে দ্রাঘিমান্তর কহে। ঐ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম দ্রাঘিমান্তর বলা যায়। অক্ষ, দ্রাঘিমান্তর উভয়ই জানিলে পৃথিবীর সকল স্থানই নিরূপণ করা যাইতে পারে।

গোলাপ।

"কিবা মনোলোভা শোভা ধরেছ গোলাপ !
হেরিলে উহার রূপ যায় মনস্তাপ ॥
কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য প্রস্ফুটিত হলে।
সুবর্ণ বিবর্ণ হয় প্রতি পলে পলে ॥
ক্রমশঃ মলিন হয় সুন্দর বরণ।
অবশেষে শুষ্ক হয়ে ভূতলে পতন ॥

এমন সৌন্দর্য্য বিধি কেন হরে লয়।
সময় হইলে দেখ কিছু নাহি রয়॥
যদিও হারায় রূপ দণ্ডেকের পরে।
তথাপি প্রভুত্ব আছে অন্য ফুলোপরে॥
যখন উহার দল যায় শুকাইয়া।
সৌন্দর্য্য তখন সব ফেলে হারাইয়া॥
এমন দশায় দেখ কিবা চমৎকার।
করিতেছে নিরন্তর সুগন্ধ বিস্তার॥
শুকালে গোলাপ দল নাহি যায় চেনা।
আঘ্রাণে গোলাপ বলে জানিবেনা কে না॥
সেই রূপ মানবের জীবন যৌবন।
নাহি থাকে ধন কিম্বা আত্মীয় স্বজন।
সময় হইলে সব বিনাশিত হয়।
তখন উহার আর কিছু নাহি রয়॥
গোলাপের মত নর হয় সুশোভিত।
গোলাপের মত ক্রমে হয় বিকশিত॥
গোলাপের মত কর সুগন্ধ বিস্তার।
মৃত হলে থাকে যেন নাহি যায় আর॥
অতএব শ্লাঘা নাহি কর কদাচন।
যেহেতু অনিত্য জেনো জীবন যৌবন॥
এই জন্য ধর্ম্ম পথে সদা দাও মন।
থাকিবে সৌরভ সব হইলে পতন॥

রসায়ণ।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে বিশ্বসংসারস্থ যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অধুনাতন পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা উহাদিগকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যে দ্রব্যকে বিযুক্ত করিলে দুই কিম্বা তদপেক্ষা অধিক ভিন্ন জাতীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ বলা যায়, যথা—জল, বায়ু ইত্যাদি। যে দ্রব্যকে বিযুক্ত করিলে দুই কি ততোঽধিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রূঢ় পদার্থ বলে, যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, গন্ধক, অঙ্গারক ইত্যাদি। মৌলিক পদার্থ দ্বিবিধ, ধাতু ও উপধাতু। যে সকল মৌলিক পদার্থ চাকচক্যশালী এবং তাপ ও তড়িতের পরিচালক তাহাদিগকে ধাতু কহে; আর ধাতু ভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলিকে উপধাতু বলে*। ধাতু আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ হয় তাহাকে বিশুদ্ধ কহে, আর যখন অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে তখন তাহাকে বিমিশ্র বলে।

---

* অম্লজান, অজ্জান, যবক্ষারজান, অঙ্গারক, হরিতক, পুতীক অরুণক, কাচাম্লক, গন্ধক, উপগন্ধক, অনুপগন্ধক, প্রস্ফুরক, টঙ্কপ্রদ, সকতাপ্রদ।

অজ্ঞান।

অপ অর্থাৎ জলের উৎপাদক বলিয়া এই মূল পদার্থটীর নাম অজ্ঞান হইয়াছে। অজ্ঞান বায়ু বর্ণবিহীন, স্বাদ রহিত ও গন্ধশূন্য। ইহাকে কেহ এপর্য্যন্ত তরল করিতে পারে নাই। বায়ু অপেক্ষা অজ্ঞান প্রায় ১৪.৫ গুণ লঘু। ইহার তুল্য লঘু পদার্থ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না, এই জন্য যাহারা ব্যোমযানে শূন্যোপরি গমন করিয়া থাকে, তাঁহারা এই বায়ু ব্যবহার করিয়া থাকেন। অজ্ঞান দাহক নহে, কিন্তু দাহ্য; ইহাতে প্রাণীর জীবনপোষক শক্তি নাই। তড়িৎ দ্বারা জলকে বিযুক্ত করিলে বিশুদ্ধ অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। পাঁচশত গ্রেইন চূর্ণ একটা বোতলের মধ্যে রাখিয়া তাহাতে তিন আউন্স জল ও এক ড্রাম গন্ধক দ্রাবক প্রদান করিলে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান ও অম্লজান যোগে ভয়ঙ্কর তাপ উৎপন্ন হয়। দুই ভাগ অজ্ঞান এক ভাগ অম্লজান, একত্র করিয়া তাহাতে বিদ্যুতীয় স্ফুলিঙ্গ কোন প্রকারে স্পর্শ করাইলে বন্দুকের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান বায়ু কোন একটা ক্ষুদ্র পাত্রে পূরিত করিয়া তাহার মুখে দীপ শিখা প্রবিষ্ট করিয়া দিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বালিতে থাকে, কিন্তু তাহার শীখা অত্যন্ত প্রভাশালী হয় না।

অম্লজান।

অম্লজান বায়ুর বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ নাই। অজ্ঞান অপেক্ষা

অম্লজান ১৬ গুণ ভারী, অর্থাৎ অজ্ঞান বায়ুর গুরুত্বকে একক দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে, অম্লজানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৬ হয়। ইহাকে এপর্য্যন্ত কেহ তরল করিতে পারে নাই। যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এই অম্লজান বায়ু তাহার পঞ্চমাংশ। অম্লজান বায়ু ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতাম না; এই জন্য ইহাকে প্রাণবায়ু বলিলেও বলা যায়। এই বায়ুর দহন ও জীবন পোষণ শক্তি আছে। এই বায়ুকে আমরা নিঃশ্বাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করি এবং ইহার দ্বারা শোণিত আরক্তিমবর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধক, লৌহময় তার প্রভৃতি অম্লজানের মধ্যে রাখিলে স্বতেজে দগ্ধ হইয়া থাকে। নানা উপায়ে এই বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তড়িৎ দ্বারা জলকে বিযুক্ত করিলে অম্লজান উৎপন্ন হয়। মেঙ্গনিক অম্লজান লৌহময় বোতলে করিয়া উত্তপ্ত করিলে অম্লজান নির্গত হয়। লৌহময় বোতলের মধ্যে সোরা চূর্ণ রাখিয়া ঐ বোতলের মুখ বন্ধ কর, পরে তথায় একটী সরু নল প্রবিষ্ট করিয়া বোতলটী উত্তপ্ত করিলে ঐ নল দিয়া অম্লজান নিঃসৃত হয়। পটাসিক ক্লরেট উত্তপ্ত করিলে অম্লজান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যালোকে বৃক্ষাদির সরস পত্রাদির দ্বারা বায়ুস্থ আঙ্গারিক অম্লের বিযুক্ত হইলে অম্লজান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পদার্থবিদ্যা।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাদিগকে জড়পদার্থ কহে। যে শাস্ত্রের দ্বারা ঐ সকল জড় পদার্থের তত্ত্বানুশীলন হইয়া থাকে, তাহাকে পদার্থ বিদ্যা কহে।

পদার্থ বিদ্যা দুই অংশে বিভাজিত হইয়া থাকে। ইহার যে অংশে জড় পদার্থের প্রকৃতি নির্নীত হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত কহে, আর যে ভাগ পাঠ করিলে প্রাকৃতিক কার্য্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান কহে। প্রাকৃতিকইতিবৃত্ত ও প্রাকৃতিকবিজ্ঞান উভয়ই তিন তিন ভাগে বিভাজিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিকইতিবৃত্তের যে ভাগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিরহিত জড় পদার্থের বিবরণ থাকে, তাহাকে খনিজবিদ্যা কহে। উহার যে ভাগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট কিন্তু স্বেচ্ছাগতিশক্তিবর্জ্জিত জড়পদার্থের বর্ণন ও বিবরণ থাকে, তাহাকে উদ্ভিজ্জ বিদ্যা কহে। আর যে ভাগে স্বেচ্ছাগতিশক্তিসম্পন্ন জড় সমস্তের বিবরণ বর্ণিত থাকে, তাহাকে প্রাণিবিদ্যা কহে।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের যে ভাগে জড়ের প্রকৃতির কোন বিকার না জন্মিয়া অর্থাৎ বস্তুর আন্তরিক কোন ভাবের পরিবর্ত্ত না ঘটিয়া কোন প্রাকৃতিক কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাহ্যবিজ্ঞান কহে। এই বাহ্যবিজ্ঞান ছয় প্রকার, যথা—যন্ত্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান,

তাপবিজ্ঞান ও দৃষ্টি বিজ্ঞান। প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের যে ভাগে বস্তুর প্রকৃতির বিকার জন্মিয়া কোন প্রাকৃতিক কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে রাসায়নিকবিজ্ঞান কহে। এই বিজ্ঞান দুই প্রকার, অব্যূঢ়পদার্থ রসায়ন ও ব্যূঢ়পদার্থ রসায়ন। আর যে ভাগে সজীব পদার্থের শরীরগত কার্য্য অর্থাৎ সজীব পদার্থ সমস্তের শরীরে যে সকল রাসায়নিক বা অতি রাসায়নিক কার্য্য লক্ষিত হয়, তাহাকে শারীরবিজ্ঞান কহে। শারীর বিজ্ঞান দুই প্রকার, উদ্ভিজ্জশারীর ও প্রাণিশারীর।

জড়পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ তিন প্রকার, তন্মধ্যে আকৃতিকে একটী প্রধান গুণ বলিতে হইবে। ইহার আর একটী নাম বিস্তৃতি; কারণ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার বিস্তার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই। আর একটী গুণের নাম স্থিতিবিরোধ অর্থাৎ পদার্থটী যে স্থানে থাকে, সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে, সুতরাং দুইটী দ্রব্য কোন রূপেই এক সময়ে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। আকৃতি ও স্থিতিবিরোধ এই দুই গুণকে জড়ের স্বতঃসিদ্ধ গুণ কহে, অর্থাৎ আমরা এক প্রকার নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা ঐ সমস্ত গুণ আছে বোধ করিয়া থাকি। জড়ের দ্বিতীয় প্রকার গুণের নাম পরীক্ষাসিদ্ধগুণ, কারণ স্বতঃসিদ্ধ গুণের মত উহা সহজে বোধগম্য হয় না। জড়ের স্থিতিবিরোধ গুণের দ্বারা ইহা যে স্থানে থাকে সেই স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু আমরা কোন বল প্রয়োগ করিয়া উহাকে পূর্ব্বস্থান চ্যুত করিতে পারি।

জড়ের তৃতীয় প্রকার গুণের নাম অনুমানসিদ্ধ গুণ, অর্থাৎ এই সকল গুণ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। আকর্ষণ জড়ের একটী অনুমানসিদ্ধ গুণ। আকর্ষণ ছয় প্রকার, মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ ও তাড়তাকর্ষণ। ইহার মধ্যে যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ এই দুইটী প্রধান। যে গুণ থাকাতে একটী বস্তুর নানা অংশে বিচ্ছিন্ন না হইয়া একত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে যোগাকর্ষণ কহে। আর যে গুণের দ্বারা দূরস্থিত বস্তু সকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। দুই খানি কাচ যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই দুইটীকে বিভিন্ন করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বল প্রদানের আবশ্যক করে। সেই কাচের একত্র থাকিবার আশয়কে যোগাকর্ষণ কহে। মাধ্যাকর্ষণের যোগাকর্ষণ হইতে এই প্রভেদ যে, উহা একটী বস্তু যত দূরে থাকুক না কেন তদুপরি তাহার কার্য্য হইতে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা চন্দ্রসূর্য্য নিজনিজ স্থানে রহিয়াছে। কোন একটী বস্তুকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে নিম্নে আসিয়া পতিত হয়, ইহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশতঃ।

সমাপ্ত।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ
BAGBAZAR READING LIBRARY
1883.